লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্

পাক্ষিক আহ্‌মদী

The Ahmadi Fortnightly Since 1922

নবপর্যায় ৮৪ বর্ষ | ৫ম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ৩১ ভাদ্র, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ | ৭ সফর, ১৪৪৩ হিজরি | ১৫ তাবুক ১৪০০ হি. শা. | ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২১ ঈসাব্দ

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে
Love for All
Hatred for None

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের আরও একটি নব-নির্মিত মসজিদ ভবনের উদ্বোধন

অদ্য ১০ই সেপ্টেম্বর ২০২১ সাল পবিত্র জুমুআর নামায আদায়ের মধ্য দিয়ে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বানিয়াজানে নব-নির্মিত মসজিদ ভবনের শুভ উদ্বোধন করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। জুমুআর নামায শেষে নব-নির্মিত মসজিদ ভবনের উদ্বোধন উপলক্ষে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ক্ষুদ্র পরিসরে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব। পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত ও নযম পাঠের পর স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং জামা'তের কর্মকর্তাবৃন্দ ছাড়াও প্রতিবেশী অ-আহমদী ব্যক্তিবর্গও উপস্থিত ছিলেন। প্রথমে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন, মাওলানা ইয়াসিন আহমদ। অতঃপর নযম পাঠ করেন মাওলানা সেলিম আহমদ। এরপর যারা শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন তারা হলেন: মাওলানা আসাদুজ্জামান রাজিব, জনাব মোজাফফর আহমেদ (সাবেক প্রেসিডেন্ট), জনাব নওয়াব (সেক্রেটারী মাল), জনাব মামুনুর রশিদ (জেনারেল সেক্রেটারী), জনাব মোফাজ্জল হোসেন (সাবেক প্রেসিডেন্ট), জনাব নুরু ভাই, জনাব আব্দুর রউফ, জনাব জয়নুল আবেদীন, জনাব সোহেল আহমদ, জনাব ছলিমুল্লাহ্ সাহেব (সাবেক প্রেসিডেন্ট, জামালপুর), মাওলানা নিয়ামুল হাসান পিয়াস, (মুরব্বী সিলসিলাহ্, জামালপুর), জনাব মোজাম্মেল হক লাল মিয়া, জনাব ফরিদুল ইসলাম (প্রেসিডেন্ট সরিষাবাড়ী), জনাব আব্দুস সামাদ (প্রতিবেশী) এবং জনাব আবুল হোসেন (প্রেসিডেন্ট, বানিয়াজান)। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি হিসেবে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন মাওলানা মাহমুদ আহমদ সুমন, মাওলানা শেখ মোস্তাফিজুর রহমান, জনাব মোহাম্মদ মাহমুদ আহমদ, জনাব মোহাম্মদ কামাল উদ্দীন এবং জনাব মোহাম্মদ নূরুদ্দীন আহমদ। এছাড়া কেন্দ্র থেকে আগত জনাব মোহাম্মদ শরীফ আহমদ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে দোয়ায় অংশ নেন।

নব-নির্মিত মসজিদ ভবনে প্রথম জুমুআর খুতবা দিচ্ছেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব

সবশেষে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব মহান আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্য ও আমাদের করণীয়– এ বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বানিয়াজানে নব-নির্মিত মসজিদ ভবন উদ্বোধনের সুবাদে আমাদের একত্র হওয়ার সৌভাগ্য দিয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ্। এই সুবাদে আজকের জুমু'আর দিন এবং এই দোয়ার ক্ষণও যেন ঐতিহাসিক হয় আর এর মাধ্যমে এখানে যেন ঈমান সঞ্চার হয়, এখানে যেন আল্লাহ্ প্রেমিকের জন্ম হয়, এখানে যেন মহানবী (সা.)-এর সত্যিকার অনুসারী মুসলমানদের জন্ম হয় এবং আজকের দিন যেন একটি বিরাট যুগের উদ্বোধনী দিন হয়। আমাদের অতীত দূর্বলতা যেন আমরা ঝেড়ে ফেলে দেই আর আগামীতে যেন আমরা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আদেশ অনুযায়ী ইসলাম পালন করতে সক্ষম হই– এটিই আমাদের বিশেষ দোয়া থাকবে। আপনাদের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, যদি আহমদী মুসলমান হয়ে থাকেন, যদি ইমাম মাহদী (আ.)-কে মেনে থাকেন, তাহলে পাঁচ বেলার নামায ঠিকমত আদায় করবেন কেননা এই মসজিদে নিয়মিত পাঁচবেলা নামায আদায়ের মাধ্যমে মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে, ইনশাআল্লাহ্। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর সৌভাগ্য দিন, আমীন।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বানিয়াজানের পুরাতন মসজিদ

উল্লেখ্য, ২১ মার্চ ২০০২ সালে বানিয়াজানে প্রথমবারের মত আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের নব-নির্মিত (টিনশেড) মসজিদ উদ্বোধন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে তৎকালীন ন্যাশনাল আমীর সাহেবের প্রতিনিধি হিসেবে জনাব মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন সাহেব সভাপতিত্ব করেন এবং কেন্দ্রীয় মুরব্বী সিলসিলাহ্ মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন।

'আহমদী' বার্তা বিভাগ

সম্পাদকীয়

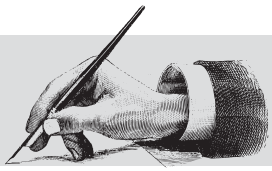

‘গুনাহ’ কী?

মহান আল্লাহ্ তা’লা পৃথিবীতে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে মানবজাতি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টির সেরা জীব হওয়ার একটি কারণ হল, মানুষ ভাল-মন্দের মাঝে পার্থক্য করতে জানে। তাবুও অনেকের হৃদয়ে প্রশ্ন জাগে, “ভাল-মন্দ তো বুঝি কিন্তু ‘গুনাহ’ বা পাপ বলতে কী বুঝায়? এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন স্বয়ং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)। তিনি (আ.) বলেন, “খোদা তা’লার সত্তা মানুষের জীবনে এক স্থায়ী প্রশান্তি এবং আনন্দের উৎস। যে ব্যক্তি তাঁর থেকে পৃথক হয় অথবা কোন না কোনভাবে তাঁকে পরিত্যাগ করে, তখন সেই ব্যক্তিকে বলা হয়- এ ব্যক্তি ‘গুনাহ’ করেছে। খোদা তা’লা মানবীয় প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি রেখে যে কাজ সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মভাবে স্বয়ং মানবসত্তার জন্য ক্ষতিকর জানেন- সে কাজের নামও রেখেছেন ‘গুনাহ’। যদিও অনেক ক্ষেত্রে মানুষ নিজের জন্য ক্ষতিকর অনেক বিষয়ে অনবহিত থাকে যেমন চুরি করা এবং অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে তার ক্ষতিসাধন করা ইত্যাদি। মোটকথা স্বয়ং নিজের পবিত্র জীবনকে ক্ষতিগ্রস্থ করার নাম ‘গুনাহ’। যেমন দেহোপজীবিনী নিজ দেহ বিক্রি করে অন্যের হিতসাধন করলেও সে নিজের প্রকৃতির পবিত্রতা বরবাদ করল আর বিভিন্ন ধরনের দৈহিক ও আধ্যাত্মিক সমস্যায় নিপতিত হল। এমনিভাবে সেসব বিষয় যা মানবীয় প্রকৃতির স্বচ্ছতা ও পবিত্রতার পরিপন্থী- সেসবই ‘গুনাহ’ বলে পরিগণিত। এসব গুণাহ’র আনুষাঙ্গিক বা দূরবর্তী বিষয়াদীও গুনাহ’র পরিশিষ্ট মনে করা হয়। খোদা তা’লা এমন এক সত্তা যিনি মহান ও সর্বজ্ঞানী, তিনি মানুষ ও অণু-পরমাণুর প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা এবং এসবকিছুর বৈশিষ্টেরও সৃষ্টিকর্তা তিনিই। তিনি তাঁর পূর্ণ প্রজ্ঞা এবং পূর্ণ জ্ঞান দ্বারা সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এটি তোমাদের জন্য ক্ষতিকর এবং এর অনুসরণ তোমাদের জন্য আদৌ কল্যাণকর নয় বরং একেবারেই ক্ষতিকর- সেক্ষেত্রে কোন সুস্থ প্রকৃতির মানুষের জন্য আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত আদেশের পরিপন্থী কাজ করা সমীচীন নয়। আমাদের চোখের সামনে ডাক্তার যখন রোগীর জন্য কোন বিশেষ খাবার নিষেধ বলে দেয় তখন অসুস্থ ব্যক্তি কত পূর্ণভাবে ডাক্তারের কথায় আমল করে, কিন্তু কেন করে? কারণ হল, সে ডাক্তারকে নিজের তুলনায় অধিক জ্ঞানী জানে। এমনিভাবে অনেক এমন বিষয় আছে যা মানুষের দেহ বা আত্মার জন্য ক্ষতিকর, তা মানুষের জানা থাকতে পারে আবার জানা না-ও থাকতে পারে। অনেক এমন বিষয় আছে যেখানে আল্লাহ্‌র নিষেধাজ্ঞা না থাকা সত্ত্বেও তা মানুষের জন্য ক্ষতিকর।...

স্মরণ থাকে, গুনাহ’র মূল সেই বিষয় যা করার ফলে সত্যিকারের পবিত্রতা এবং তাকওয়া এবং স্বচ্ছতা থেকে মানুষ দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। অথচ খোদা তা’লার সাথে সত্যিকারের প্রেমবন্ধন এবং তাঁর সাক্ষাতই সত্যিকারের প্রশান্তির কারণ হয়ে থাকে। তাই খোদার সাথে দূরত্ব সৃষ্টি হওয়া এবং তাঁর থেকে পৃথক হওয়াও ‘গুনাহ’।...

প্রত্যেক ব্যক্তি গুনাহ কী- তা অনুভব করতে সক্ষম। দেখুন, কোন ব্যক্তি যখন নিরপরাধ ব্যক্তিকে চড় মারে তখন সে জানে- আমার চড় মারা ঠিক হয় নি। যখন তার মাথা ঠাণ্ডা হয় তখন নিজের মাঝে অনুতাপ এবং লজ্জা অনুভব করে এবং বুঝতে পারে- ‘আমি অন্যায় করেছি’। অপরদিকে কোন ব্যক্তি যখন কোন অভুক্ত ব্যক্তিকে খাবার খাওয়ায়, তৃষ্ণার্ত ব্যক্তিকে পানি পান করায়, বস্ত্রহীনকে পোষাক পরিধান করায় তখন সে নিজ মনে এই ভেবে পরিতৃপ্ত হয় যে, ‘আমি সত্যিই ভাল কাজ করেছি’। মানুষের হৃদয় এবং আত্মচেতন ঈমানের আলো প্রত্যেক কাজের সময় তাকে জানিয়ে দেয়- ‘এটি পাপ অথবা এটি পুণ্য’।” *(মালফুযাত, দশম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৫৭-৩৫৯)*

সূচিপত্র

১৫ সেপ্টেম্বর ২০২১

কুরআন শরীফ ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃতবাণী ৫

ইযালায়ে আওহাম (দ্বিতীয় অংশ) ৬

১৬ জুলাই, ২০২১ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডে অবস্থিত মুবারক মসজিদে প্রদত্ত হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর **জুমুআর খুতবা** ৮
বিষয়: ***হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকাল***

২৩ জুলাই, ২০২১ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডে অবস্থিত মুবারক মসজিদে প্রদত্ত হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর **জুমুআর খুতবা** ১৮
বিষয়: ***হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর স্মৃতিচারণ***

'রূহানী খাযায়েন'-এর পরিচয়পর্ব ২৮
মূলঃ হযরত মাওলানা জালালুদ্দিন শামস সাহেব
ভাষান্তর: মাওলানা আবু সালেহ আহমদ মণ্ডল

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর অনুপম জীবনের কিছু দিক ২৯
মাওলানা আহমদ তারেক মুবাশ্বের

সীরাতুল মাহদী (আ.) ৩২
প্রণেতা: হযরত মির্যা বশির আহমদ এম.এ. (রা.)
ভাষান্তর: মাওলানা জুবায়ের আহমদ

একজন শাহ্‌যাদার সত্য কাহিনী ৩৪
মূল: হাফেয মোজাফ্‌ফর আহমদ
ভাষান্তর: মাওলানা আরিফুর রহিম

পর্ব-২০ ৩৬
প্রাণপ্রিয় হুযূর (আই.)-এর সাথে মোলাকাতে প্রশ্নোত্তর

আমার শ্বশুর মরহুম শাহাবউদ্দিন সাহেব স্মরণে ব্যক্তিগত কিছু কথা ৪০
খোরশেদ জাহান

গায়ের আহমদী বিবাহের ক্ষেত্রে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাবধান বাণী ৪২

সংবাদ ৪৩

শোক সংবাদ ৪৩

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর হাতে বয়আত গ্রহণের দশটি শর্ত ৪৪

প্রচ্ছদ পরিচিতি: **আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বানিয়াজানে নব-নির্মিত মসজিদ ভবন**

কুরআন শরীফ

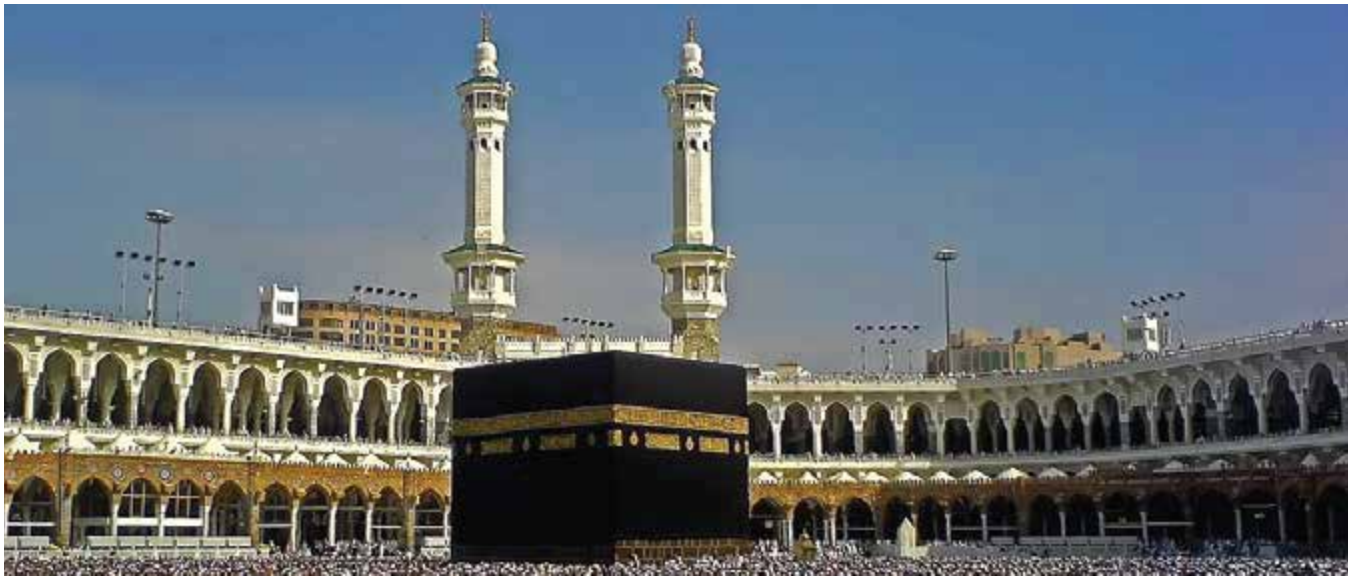

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ﴿۱﴾ اِنَّاۤ اَعۡطَیۡنٰکَ الۡکَوۡثَرَ ﴿۲﴾ فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَ انۡحَرۡ ﴿۳﴾ اِنَّ شَانِئَکَ ہُوَ الۡاَبۡتَرُ ﴿۴﴾

অনুবাদঃ স্বতঃপ্রণোদিত অসীম দাতা পরম করুণাময়, বার বার কৃপাকারী আল্লাহ্‌র নামে। আমরা তোমাকে অধিক পরিমাণে তত্ত্বজ্ঞান দান করেছি, অতএব তুমি এর কৃতজ্ঞতাস্বরূপ নামায পড় এবং কুরবানী দাও। নিশ্চয় তোমার যে শত্রু, সে-ই নিঃসন্তান থাকবে। *(সূরা আল-কাউসার: ১-৪) (বারাহীনে আহমদীয়া, চতুর্থ খণ্ড, রূহানী খাযায়েন, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৬১৮)*

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন: "আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে বলেছিলেন, **"ইন্না আ'তাইনা কাল কাউসার"**- এটি সেই যুগের কথা যখন অস্বীকারকারীরা বলত, তাঁর (সা.) তো কোন পুত্রসন্তান নেই। তবে তারা 'আবতার' শব্দ ব্যবহার করেছিল কি-না, তা জানা নেই। প্রকৃত বিষয় হল, আধ্যাত্মিকভাবে যারা মহানবী (সা.)-এর অনুসারী হবে, প্রকৃতপক্ষে তারা মহানবী (সা.)-এর সন্তান বলে পরিগণ্য হবে এবং তারা তাঁর (সা.) জ্ঞান ও বরকতের উত্তরাধিকারী হবে, ফলে সেই জ্ঞান ও বরকত থেকে অংশ লাভ করবে। পবিত্র কুরআনে যেখানে বলা হয়েছে **"মা কানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিম মির্‌রিজালিকুম ওয়ালাকির্ রাসূলাল্লাহি ওয়া খাতামান নাবিয়্যিন।"** *(আল-আহযাব: ৪১)*

উক্ত আয়াতের সাথে 'সূরা কাউসার' মিলিয়ে পড়লে প্রকৃত বিষয়টি উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। যদি মহানবী (সা.)-এর আধ্যাত্মিক সন্তানের বিষয়টি অস্বীকার করা হয় তাহলে তিনি (সা.) 'আবতার' [তথা নিঃসন্তান] সাব্যস্ত হন (আমরা এ বিষয়ে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাই) অথচ 'আবতার' তো তাঁর (সা.) শত্রুপক্ষের জন্য নির্ধারিত। তাই **"ইন্না আ'তাইনা কাল কাউসার"** দ্বারা বুঝা যায়, মহানবী (সা.)-কে বহু আধ্যাত্মিক সন্তান দেয়া হয়েছে। অতএব তাঁকে (সা.) অধিক সংখ্যায় আধ্যাত্মিক সন্তান দান করা হয়েছে- আমরা যদি এই বিশ্বাস না রাখি তাহলে আমরা উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী অস্বীকারকারী বলে সাব্যস্ত হব। তাই সর্বাবস্থায় প্রত্যেক সত্যিকার মুসলমানের একথা স্বীকার করতে হবে এবং স্বীকার করা উচিত যে, মহানবী (সা.)-এর পবিত্রকরণ শক্তি সদাসর্বদা তেমনই আছে যেমনটি তের'শ বছর পূর্বে ছিল, উপরন্তু সেই পবিত্রকরণ শক্তির প্রমাণ হিসেবে খোদা তা'লা এই সিলসিলাহ্ প্রতিষ্ঠা করেছেন আর এখনও সেই নিদর্শন এবং কল্যাণ প্রকাশিত হচ্ছে যা সেই যুগে প্রকাশিত হয়েছিল।" *(আল-হাকাম, সপ্তম খণ্ড, নং: ১৯, ২৪ মে ১৯০৩ সাল, পৃষ্ঠা: ২)*

হাদীস শরীফ

আর্থিক কুরবানী

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ـ رضى الله عنه ـ يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ بِالْمَدِينَةِ نَخْلاً، وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ، وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ، فَلَمَّا أُنْزِلَتْ (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) قَامَ أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ (**لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ**) وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَىَّ بَيْرُحَاءَ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ، أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ، فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " **بَخْ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ**، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ ". قَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ.

(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুত্ তফসীর, হাদীস নং: ৪১৯৭)

ইসমাঈল (রহ.) ... আনাস ইবনু মালিক (রা.) বলেন, মদিনা মনোয়ারায় আবূ তালহা (রা.)-ই অধিক সংখ্যক খেজুর বৃক্ষের মালিক ছিলেন। তার নিকট সর্বাধিক প্রিয় সম্পত্তি ছিল "বাইরূহা" নামক বাগান। আর তা ছিল মসজিদের সম্মুখে। রসূলুল্লাহ (সা.) সেখানে এসে সেখানকার (কূপের) সুমিষ্ট পানি পান করতেন। যখন لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ আয়াতটি নাযিল হল, তখন আবূ তালহা (রা.) উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আল্লাহ্ বলেছেন, "তোমরা যা ভালবাস তা হতে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো পুণ্য লাভ করতে পারবে না।" (সূরা আলে ইমরান: ৯৩) আমার সর্বাধিক প্রিয় সম্পত্তি বাইরূহা। এটা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমি দান করে দিলাম। আমি আল্লাহর নিকট পুণ্য ও সঞ্চয় চাই। আল্লাহ আপনাকে যেখানে নির্দেশ দেন আপনি সেখানে তা ব্যয় করুন। মহানবী (সা.) বললেন, বাহ! সেটি তো ক্ষয়িষ্ণু সম্পদ, সেটি তো ক্ষয়িষ্ণু সম্পদ, তুমি যা বলেছ আমি তা শুনেছি। তুমি তা তোমার নিকটাত্মীয়দের দিয়ে দাও, আমি এ রায় দিচ্ছি। আবূ তালহা (রা.) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি তা করব। তারপর আবূ তালহা (রা.) সেটা তাঁর চাচাতো ভাইবোন ও আত্মীয়দের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: আল্লাহ্ তা'লা প্রকৃত পুণ্য লাভের উপায় বলেছেন প্রিয় জিনিস তাঁর পথে ব্যয় করা। কারও কাছে যদি নিজ সম্পদ প্রিয় হয়ে থাকে তাহলে সম্পদ থেকে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করা আল্লাহ্‌র প্রিয়ভাজন বানায়। তবে উক্ত হাদীস থেকে আরও একটি বিষয় সুস্পষ্ট হয় আর তা হল, প্রিয় সম্পদ নিজে নিজে ব্যয় না করে বরং আল্লাহ্‌র নবী অথবা তাঁর খলীফার হাতে (তথা বায়তুল মালে) তুলে দেয়া সাহাবীদের ইতিহাস থেকে প্রমাণিত। এর ফলেই সাহাবীরা 'রাযীয়াল্লাহু আনহুম ওয়া রাযূ আনহু' এর মাঝে পরিগণিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। আল্লাহ্ আমাদেরকেও এর সৌভাগ্য দিন।

অমৃতবাণী

এলহাম, কাশ্‌ফ ও স্বপ্নের তিনটি ধরন

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন: এলহাম, কাশ্‌ফ অথবা স্বপ্ন তিন ধরনের হয়ে থাকে। প্রথমত সেই (এলহাম, কাশ্‌ফ ও স্বপ্ন) যা খোদার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে এবং তা এমন ব্যক্তির প্রতি অবতীর্ণ হয় যাঁর পূর্ণরূপে আত্মার পবিত্রতা লাভ হয়েছে আর তিনি বহু মৃত্যু এবং বহুবার আত্মবিলীন হবার অবস্থা লাভ করেন আর এমন ব্যক্তি আত্মার প্রবঞ্চনা থেকে একেবারেই পবিত্র থাকেন এবং তাঁর ওপর এমন মৃত্যু আপতিত হয় যা তাঁর অন্তরের সকল পঙ্কিলতা জ্বালিয়ে দেয় যার মাধ্যমে তিনি খোদার নৈকট্য এবং শয়তান থেকে দূরত্ব লাভ করেন, কেননা যে ব্যক্তি যার পাশে থাকে তার আওয়াজই শুনতে পায়।

দ্বিতীয়ত 'হাদীসুন নাফ্‌স' যার মাঝে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার সংমিশ্রণ থাকে আর মানুষের নিজ চিন্তাধারা এবং কামনাবাসনা এর মাঝে বহুল পরিমাণে অন্তর্ভুক্ত থাকে, যেভাবে বিখ্যাত উপমায় বলা হয়, বিড়াল স্বপ্নে কেবল পঁচা গোশত দেখে। এক্ষেত্রে মানুষ তা-ই দেখে যা সে নিজ হৃদয়ে কল্পনা করে আর যেভাবে ছাত্ররা দিনে বই পড়লে রাতে অনেক সময় সেই পড়া তাদের মুখ দ্বারা উচ্চারিত হয়– একেই বলে 'হাদীসুন নাফ্‌স'।

তৃতীয়ত শয়তানী এলহাম। এর মাঝে শয়তান অদ্ভুতসব ধোঁকা দেয়। কখনও স্বর্ণের সিংহাসন দেখায় আর কখনও অদ্ভুতসব দৃশ্য দেখিয়ে বিভিন্ন মনোমুগ্ধকর প্রতিশ্রুতি দেয়। একদা সৈয়দ আব্দুল কাদের (রহ.)-কে শয়তান নিজ স্বর্ণের সিংহাসনে দেখা দেয় আর বলে, আমি তোমার খোদা। আমি তোমার ইবাদত কবুল করেছি। এখন তোমার আর কোন ইবাদত করার আবশ্যকতা নেই আর অন্যদের জন্য এখন যা হারাম সেসব জিনিস তোমার জন্য হালাল করে দেয়া হল। সৈয়দ আব্দুল কাদের (রহ.) জবাবে বলেন, দূর হ শয়তান। যেসব জিনিস মহানবী (সা.)-এর জন্য হালাল ছিল না, তা আমার জন্য কীভাবে হালাল হতে পারে? এরপর শয়তান বলল, হে আব্দুল কাদের! তুমি আমার হাত থেকে জ্ঞানের জোরে রক্ষা পেলে, অন্যথায় এসব ক্ষেত্রে খুব কম লোক রক্ষা পায়।

(মালফুযাত, দশম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১১-১২*)*

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

ইযালায়ে আওহাম (দ্বিতীয় অংশ) (সন্দেহ-সংশয় নিরসন)

'তাওয়াফ্‌ফি' শব্দ এবং 'দাজ্জাল' সম্পর্কে হাজার রুপির ইশ্‌তেহার

প্রণয়ন ও প্রকাশনা ১৮৯১

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.)

(৬৩তম কিস্তি)

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

(সূরা আল বাকারা: ১০৭)

[অর্থাৎ, 'তুমি কি জান না, নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ে (যা তিনি চান) সর্বসক্ষম?'

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ

(সূরা আলে ইমরান: ১৪৬)

'এবং আল্লাহ্‌র আদেশ ছাড়া কোন প্রাণী মরতে পারে না' [–অনুবাদক]।'

পৃষ্ঠা ৫৮৭ সম্পর্কিত টীকা

পুরো আয়াতটি হল:

اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسٰٓى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَاَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ

(সূরা আলে ইমরান: ৫৬)

এ আয়াতটিতে খোদা তা'লা ক্রমধারায় নিজেকে কর্তা হিসেবে নিজের চারটি ক্রিয়া একাদিক্রমে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, 'হে ঈসা! আমি তোমাকে (১) ওফাত (মৃত্যু) দেব, (২) আমার দিকে উঠাব, (৩) অস্বীকারকারীদের অপবাদ থেকে তোমাকে পবিত্র সাব্যস্ত করব এবং (৪) তোমার অনুসারীদেরকে তোমার অস্বীকারকারীদের ওপর কিয়ামত দিবস অবধি প্রাধান্য দান করব।' (সূরা আলে ইমরান: ৫৬)। আয়াতটিতে এ চারটি বাক্য স্বাভাবিক ক্রমধারায় বর্ণিত হয়েছে। কেননা নিঃসন্দেহে যে ব্যক্তিকে খোদা তা'লার দিকে ফিরে যাওয়ার জন্য ডাকা হয় এবং **"ইরজিয়ী ইলা রাব্বিক"** [('তোমার প্রভু-প্রতিপালকের দিকে ফিরে এসো') সূরা আল-ফজর: ২৯] সম্পর্কিত সংবাদ তার নিকট পৌঁছে যায়, তখন তার ওফাতপ্রাপ্তি বা মৃত্যুবরণ আবশ্যক হয়ে থাকে। এরপর উক্ত আয়াত ও সহীহ্ হাদীস অনুযায়ী খোদা তা'লার দিকে তার 'রাফা' হয়। ওফাতের পর খোদা তা'লার দিকে মু'মিনের আত্মার 'রাফা' বা উন্নীত হওয়া আবশ্যক। এ সম্পর্কে কুরআন করীম ও সহীহ্ হাদীসসমূহ সোচ্চার রয়েছে। অতঃপর খোদা তা'লা হযরত ঈসাকে বলেন, 'আমি তোমাকে কাফেরদের সমস্ত অপবাদ থেকে পবিত্র সাব্যস্ত করব।' এটি এ বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত যে, ইহুদিরা চেয়েছিল, হযরত ঈসা যেন ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা যান, যাতে তওরাত অনুযায়ী তাঁর অভিশপ্ত মৃত্যু সাব্যস্ত হয়। কিন্তু খোদা তা'লা তাঁকে সুসংবাদ দান করেন যে ক্রুশজনিত মৃত্যু থেকে তাঁকে রক্ষা করবেন। যাতে সাব্যস্ত হয় যে, তাঁর আত্মা আল্লাহ্‌র দিকে সসম্মানে উন্নীত হয়েছে এবং তিনি আল্লাহ্‌র কৃপাভাজন হয়েছেন। অতএব, এ আয়াতটিতে আল্লাহ্ তাঁকে শুভসংবাদ দিয়েছেন, 'আমি তোমাকে (১) স্বাভাবিক মৃত্যু দেব, (২) তোমাকে আমার দিকে 'রাফা' দান বা উন্নীত করব, (৩) শত্রুর সমস্ত অপবাদ থেকে তোমাকে পবিত্র সাব্যস্ত করব এবং (৪) তোমার অনুসারীদেরকে তোমার অস্বীকারকারীদের ওপর প্রাধান্য দান করব।' স্বাভাবিক ক্রমধারায় বর্ণিত এ চারটি প্রতিশ্রুতি 'ফাসাহাত ও বালাগাত' বা প্রাঞ্জলতায় নিঃসন্দেহে কুরআন করীমের শ্রেষ্ঠত্ব সাব্যস্ত করে। এস্থলে 'তাওয়াফ্‌ফি' শব্দটির অর্থের মাঝেও স্বাভাবিক মৃত্যুর দিকে স্পষ্টত ইঙ্গিত রয়েছে। এ কারণে মুফাস্‌সেরীনের মাঝে 'কাশ্‌শাফ' প্রণেতা (আল্লামা যামাখ্‌শারী) ইত্যাদি **'ইন্নি মুতাওয়াফ্‌ফিকা'** আয়াতের তফসীর লিখেছেন, 'ইন্নি মুমিতুকা হাত্তা আন্‌ফিকা।' বস্তুত এ ইঙ্গিত আয়াতে বর্ণিত তৃতীয় বাক্যটিতে (মুতাহ্‌হিরুকা মিনাল্লাযীনা কাফারু-এর মাঝে) আরও বেশি রয়েছে। কেননা হযরত ঈসার স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ সাব্যস্ত হওয়ার পর নবী ও পবিত্রদের ধারায় আল্লাহ্‌র দিকে তাঁর আত্মার 'রাফা' বা উন্নীত হওয়া সাব্যস্ত হয়েছে। তখন নিঃসন্দেহে তিনি অস্বীকারকারীদের ষড়যন্ত্র ও অপবাদগুলো থেকেও দায়মুক্ত ও পবিত্র সাব্যস্ত হয়েছেন এবং তাঁর অনুসারীদের ওপর প্রাধান্য লাভ সম্পর্কিত বিষয়টিও বর্ণনা ও স্বাভাবিক ক্রমধারা উভয় দিক দিয়ে চতুর্থ ধাপে রয়েছে। এটাই 'ফাসাহাত ও বালাগাত' বা বাগ্মিতা ও প্রাঞ্জলতায় কুরআন করীমের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত। সূরা ফাতিহায় আল্লাহ্‌র প্রধান চারটি গুণও অনুরূপ প্রাঞ্জল ও স্বাভাবিক ক্রমধারায় বর্ণিত।

কিন্তু সাম্প্রতিক কালের কিছু উগ্রবাদী মোল্লা (আলেম-উলামা) **"ইউহাররেফুনাল্ কালেমা আন মাওয়াযিয়িহি"** (সূরা নিসা: ৪৭) আয়াতে বর্ণিত ইহুদিদের অনুকরণে আল্লাহ্‌র কালামসমূহকে অদলবদল করতেও ভ্রুক্ষেপ করে নি এবং হযরত ঈসা (আ.)-কে পার্থিব দেহে জীবিত বলে প্রমাণ করতে তারা দিশেহারা হয়ে আল্লাহ্‌র কালামে হস্তক্ষেপ বা অদলবদল করতে কোমর বেঁধে তৎপর হয়েছে। আলোচ্য আয়াতটিতে স্বাভাবিক ক্রমধারায় বর্ণিত চারটি বাক্যের মাঝে প্রথম দুটি অর্থাৎ (১) **'ইন্নি মুতাওয়াফ্‌ফিকা'** (২) **'ওয়া রাফিউকা ইলাইয়া'** সম্পর্কে তারা বলেন যে, প্রথমটি পরে যাবে এবং পরেরটি আগে আসবে। পরিতাপ, এ লোকগুলো পবিত্র ও মহান আয়াতটিকে আল্লাহ্ কর্তৃক এর পরম প্রাঞ্জলতায় বিন্যস্ত ও স্বাভাবিক ক্রমধারায় বর্ণনা করা সত্ত্বেও স্বেচ্ছাচারিতামূলকভাবে এর অর্থ ও প্রকৃতরূপকে বিকৃত করেছে এবং ইহুদিদের মত আল্লাহ্‌র কালামে প্রক্ষেপণ ও অদলবদলের মাধ্যমে বিকৃতি ঘটিয়েছে। তারা তাদের এই কার্যক্রম দ্বারা চরম ঈমানশূন্যতা প্রমাণ করছে।

তারা অত্যন্ত সুশৃঙ্খল বিন্যাসে বর্ণিত খোদা তা'লার এই চারটি বাক্যের মাঝে দুটি বাক্যে স্বাভাবিক ক্রমধারা অস্বীকার করে বসেছেন। অর্থাৎ তারা বলেন, **'মুতাহ্‌হিরুকা মিনাল্লাযিনা কাফারু'** এবং **'জায়েলুল্লাযিনাত্তাবাউকা'** ৩ ও ৪ নম্বর বাক্য দুটি যদিও স্বাভাবিক ক্রমধারায় অবস্থিত কিন্তু প্রথম দুটি বাক্য অর্থাৎ **"ইন্নি মুতাওয়াফ্‌ফিকা' ওয়া রাফিউকা ইলাইয়া"** (–'আমি তোমাকে স্বাভাবিক মৃত্যু দিব, এবং 'আমার দিকে তোমাকে উঠাব') স্বাভাবিক শৃঙ্খলায় অবস্থিত নয়। বরং প্রথমটি পরবর্তীতে হবে এবং পরবর্তীটি প্রথমে হবে। আফসোস, এ লোকগুলো সর্বশ্রেষ্ঠ কালামকারী আল্লাহ্ জাল্লাশানুহুর প্রাঞ্জলতায় সর্বোত্তম প্রাকৃতিক বিন্যাসের পবিত্রতাহানি এবং পরিবর্তন করে আল্লাহ্‌র কালামকে বিকৃত করল। কিন্তু ইহুদিদের মত আল্লাহ্‌র কালামে এতসব 'তাহরিফ' বা প্রক্ষেপণ ও পরিবর্তন করা সত্ত্বেও এ তাহরীফকারীদের উদ্দেশ্য সফল হতে পারে নি। কেননা, এমতাবস্থায় এর অর্থ হবে, "হে ঈসা! আমি তোমাকে আমার দিকে উঠাব এবং তোমাকে ওফাত (মৃত্যু) দিব– এতে করে এটাই সাব্যস্ত হয় যে তাঁর মৃত্যু আকাশে কোথাও হবে। কেননা, 'রাফা'-এর পরে যখন মৃত্যুর উল্লেখ রয়েছে এবং মাঝে কোথাও নযূল বা অবতীর্ণ হওয়ার উল্লেখ নেই তখন যদি 'রাফা' ও তাওয়াফফি'র মাঝে আরেকটি বাক্য বানিয়ে বসানো হয় তাহলে অর্থ জুতসই হবে এবং বলা হয়: **'ইয়া ঈসা ইন্নি রাফিউকা ওয়া মুনায্‌যিলুকা ওয়া মুতাওয়াফ্‌ফিকা'** (অর্থাৎ, 'হে ঈসা! আমি তোমাকে আমার দিকে উঠাব এবং নামাব এবং তোমাকে মৃত্যু দিব') তখন এতগুলো 'তাহরিফ' বা প্রক্ষেপণ পরিবর্তনের পর খোদা তা'লার কালাম নয়, বরং এগুলি হবে উগ্রবাদী সেই 'তাহরীফ' বা প্রক্ষেপকারীর কথা যে উগ্রতার বশবর্তী হয়ে নির্লজ্জভাবে এসব বাক্য রচনা করেছে। আর তাই তারা বলেন, 'এসমস্ত পরিবর্তন প্রয়োজন ছাড়া বিনা কারণে করা হয় নি, বরং কুরআন করীমের আয়াতগুলোকে হাদীসের সঙ্গে সমন্বয় করানোর উদ্দেশ্যে করা হয়েছে।"

এর উত্তর হল, আয়াত এবং হাদীসের মাঝে পরস্পরবিরোধ সৃষ্টি হতে দেখা গেলে প্রথমত মুফাস্‌সের ও মুহাদ্দেসগণের মূলনীতি এটাই যে, যথাসম্ভব হাদীসের অর্থ কুরআনের সাথে সমন্বয়মূলক ব্যাখ্যা করতে হবে। যেমন, সহীহ্ বুখারীর 'কিতাবুল জানায়েয'-এর ১৭২ পৃষ্ঠায় পরিষ্কার লেখা আছে যে, হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) **"ইন্নাল মাইয়িতা ইউআয্‌যাবু বি-বা'ঘি বুকায়ে আহ্‌লিহি"** (অর্থাৎ, মৃত ব্যক্তি তার পরিবারের কারও কারও বিলাপের দরুন শাস্তি ভোগ করে।– অনুবাদক) হাদীসটিকে 'লা তাযিরু ওয়াযিরাতুঁ ভিয্‌রা উখরা' (সূরা আনআম: ১৬৫)– আয়াতের বিরোধী দেখতে পেয়ে আয়াতটির সাথে এর সমন্বয়মূলক ব্যাখ্যা করেছেন যে, এটি মু'মিনদের সম্পর্কে নয় বরং কাফেরদের সাথে সম্পৃক্ত, যারা পরিজনদের বিলাপে সন্তুষ্ট ছিল, বরং তারা এর জন্য তাদের তাগিদপূর্ণ নির্দেশ দিত। অতঃপর **সহীহ্ বুখারীর ১৮৩ পৃষ্ঠায় লেখা হাদীস 'কালা হাল্ ওজাদতুম মা ওয়াদাকুম রাব্বুকুম হাক্কা'**– (অর্থাৎ বদরের ময়দানে নিহত কাফেরদের কবরগুলোকে উদ্দেশ্য করে নবী করীম (সা.) বলেন, তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক তোমাদের সাথে যা ওয়াদা করেছিলেন তার সত্যতা কি বুঝে পেয়েছ?'– এ হাদীসটি হযরত আয়েশা (রা.)-এর বাহ্যিক ও সরল অর্থ অনুযায়ী গ্রহণ করেন নি– এ অজুহাতে যে, এটি কুরআন করীমের নিম্নরূপ আয়াতের পরিপন্থী: **'ইন্নাকা লা তুস্‌মিউল্ মাউতা'** (সূরা নামল: ৮১) এবং ইবনে-উমর (রা.) বর্ণিত হাদীসকে শুধু এ কারণে অগ্রাহ্য করেছেন যে, এরকম অর্থ কুরআন– বিরোধী। সহীহ্ বুখারী ১৮৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ...*(চলবে)*

ভাষান্তর:
মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ
মুরব্বি সিলসিলাহ্ (অব.)

পাক্ষিক **'আহ্‌মদী'** নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন। পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন– পাক্ষিক **'আহ্‌মদী'**র সাথেই থাকুন। ইন্টারনেটের মাধ্যমে **'আহ্‌মদী'** পত্রিকা পড়তে Log in করুন **www.theahmadi.org**
পাক্ষিক 'আহ্‌মদী'র নতুন ই-মেইল আইডি–
pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com

১৬ জুলাই, ২০২১ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডে অবস্থিত মুবারক মসজিদে প্রদত্ত

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর জুমুআর খুতবা

বিষয়:

হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকাল

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকাল সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল। সে যুগে যেসব যুদ্ধ হয়েছে আর যেসব বিজয় অর্জিত হয়েছে– সে সম্পর্কে লেখা আছে (এটি ত্রয়োদশ হিজরী থেকে ২৩তম হিজরীর ইতিহাস) হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকাল প্রায় সাড়ে দশ বছর বিস্তৃত ছিল। সে যুগে অর্জিত বিভিন্ন বিজয়ের ব্যাপকতার উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লামা শিবলী নু'মানী তার গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত উমর (রা.) কর্তৃক বিজিত অঞ্চলের মোট আয়তন দাঁড়ায় বাইশ লক্ষ একান্ন হাজার ত্রিশ বর্গমাইল। এসব বিজিত অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলো হল, সিরিয়া, মিশর, ইরান ও ইরাক, কুর্দিস্তান, আরমেনিয়া, আযারবাইজান, পারস্য, কিরমান, খুরাসান ও মাকরান– যার মধ্যে বেলুচিস্তানেরও কিছু অংশ অন্তর্ভুক্ত।

ইসলামী যুদ্ধ এবং বিজয়ের ধারা তো হযরত আবু বকর (রা.)-এর যুগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। হযরত আবু বকর (রা.)-এর যুগে সিরিয়া এবং ইরাকে ইসলামী সেনাদল জিহাদে রত ছিল আর একই সময়ে বিভিন্ন রণাঙ্গনে যুদ্ধ হচ্ছিল, এরপর এই ধারা চলমান থাকে এবং হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালেও একইভাবে অব্যাহত থাকে। হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে একটি বিষয় বিশেষভাবে দৃষ্টিগোচর হয় আর তা হল,

হযরত উমর (রা.) তাঁর সকল ব্যস্ততা সত্ত্বেও প্রতিটি বিজয়ের সময় মুসলমান সেনাদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন। যদিও তিনি তাঁর খিলাফতকালে কোন যুদ্ধেই রীতিমত অংশগ্রহণ করেন নি, কিন্তু তা সত্ত্বেও সৈন্যদের বিষয়ে মুসলমান সেনাপতিদের সকল নির্দেশনা তিনি মদিনা থেকেই প্রেরণ করতেন অথবা তিনি যেখানেই অবস্থান করতেন সেখান থেকে তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। বরং কোন কোন যুদ্ধের বৃত্তান্ত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মুসলমান সেনাপতিদের সাথে প্রতিদিন হযরত উমর (রা.)-এর পত্র আদানপ্রদান হত আর হযরত উমর (রা.) মদিনায় বসে মুসলিম সেনাদের সুশৃঙ্খল বা সুবিন্যস্ত করার নির্দেশ দিতেন এবং তাদেরকে সেসব অঞ্চল সম্পর্কে এমনভাবে বলতেন বা নির্দেশনা প্রদান করতেন যেন হযরত উমর (রা.)-এর সামনে সেসব অঞ্চলের মানচিত্র ছিল বা সেসব অঞ্চল হযরত উমর (রা.)-এর নখদর্পণে ছিল। ইমাম বুখারী (রহ.) সহীহ্ বুখারীতে হযরত উমর (রা.) সম্পর্কে লিখেছেন যে,

وقال عمر رضى الله عنه انى لاجهز جيشى وانا فى الصلوة

(উচ্চারণ: ওয়াক্বালা উমারু রাযিআল্লাহু আনহু ইন্নি লাউজাহিযু জায়শী ওয়া আনা ফীস্ সালাত) অর্থাৎ, হযরত উমর (রা.) বলতেন, আমি নামাযরত অবস্থায় আমার সেনাদল বিন্যস্ত করি। অর্থাৎ তিনি এত বেশি চিন্তিত থাকতেন যে, নামাযের সময়ও ইসলামী সেনাবাহিনী সংক্রান্ত পরিকল্পনা এবং অন্যান্য কাজ জারী থাকত, আর সে সময় হয়তো দোয়াও করে থাকবেন। এ কারণেই আমরা বিভিন্ন জায়গায় দেখতে পাই যে, তাঁর নির্দেশ অনুসরণে মুসলিম সেনাবাহিনী কঠিন থেকে কঠিনতর পরিস্থিতিতেও আল্লাহ্ তা'লার দয়া ও অনুগ্রহে বিজয় অর্জন করেছে।

সৈয়দ মীর মাহমুদ আহমদ সাহেবও হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকাল সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, সেখান থেকেও আমাদের নোট প্রস্তুতকারী রিসার্চ সেল কোন কোন উদ্ধৃতি গ্রহণ করেছে। যাহোক মূল উৎসও চেক করা হয়েছে, (এবং তা) ঠিক আছে। ইরান ও ইরাকের বিজয় সম্পর্কে তিনি লিখেন যে, হযরত আবু বকর (রা.)-এর যুগে পারস্যবাসী বা ইরানিদের সাথে যুদ্ধ চলাকালে হযরত আবু বকর (রা.) অসুস্থ হয়ে পড়েন, যে কারণে ইসলামী সেনাদলের বিভিন্ন বার্তা পেতে বিলম্ব হচ্ছিল। এ কারণে হযরত মুসান্না ইসলামী সেনাবাহিনীতে নিজের স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে স্বয়ং হযরত আবু বকর (রা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন যেন তাঁকে যুদ্ধাবস্থা সম্পর্কে অবগত করা এবং অতিরিক্ত সাহায্যের অনুরোধ করা যায়। হযরত মুসান্না মদিনায় পৌঁছে হযরত আবু বকর (রা.)-কে ঘটনাবলী অবহিত করেন, তখন হযরত আবু বকর (রা.) হযরত উমরকে ডাকেন এবং এই ওসীয়্যত করেন যে, হে উমর! আমি যা কিছু বলছি তা মনোযোগ দিয়ে শোন এবং সে অনুসারে কাজ কর। আজ সোমবার, আমার মনে হচ্ছে আমি আজই মৃত্যুবরণ করব (এটি হযরত আবু বকর বলছেন)। আমি যদি মারা যাই তাহলে সন্ধ্যা হওয়ার পূর্বেই মানুষকে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করে মুসান্নার সাথে প্রেরণ করবে। আর আমার মৃত্যু যদি রাত পর্যন্ত বিলম্বিত হয় তাহলে সকাল হওয়ার পূর্বেই মুসলমানদের একত্র করে মুসান্নার সাথে পাঠিয়ে দিও। আমার মৃত্যুর বিপদ যত বড়-ই হোক না কেন, তা যেন তোমাকে ধর্মের নির্দেশ এবং খোদা তা'লার নির্দেশ পালন থেকে কোনভাবে বিরত না রাখে। তুমি দেখেছ যে, মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর সময় আমি কী করেছিলাম। অথচ মানুষ এবং অন্যান্য সৃষ্টি এমন বিপদের সম্মুখীন কখনও হয় নি। খোদার কসম, আমি যদি তখন মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ পালনে সামান্য বিলম্ব করতাম তাহলে খোদা তা'লা আমাদের লাঞ্ছিত করতেন, আমাদের শাস্তি দিতেন আর মদিনায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠত। অতএব হযরত আবু বকরের মৃত্যুর পর হযরত উমর খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হতেই এই ওসীয়্যত বাস্তবায়নে হযরত আবু বকরকে দাফন করার পরবর্তী দিনই মানুষকে জড়ো করেন। খিলাফতের বয়আত করার জন্য সকল দিক থেকে অসংখ্য মানুষ এসেছিল এবং তিনদিন পর্যন্ত তাদের লাইন লেগে থাকে। হযরত উমর এই সুযোগকে আশীর্বাদ মনে করেন আর গণজমায়েতের সামনে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করেন, কেননা আরবরা প্রাচীনকাল থেকেই ইরানের জাঁকজমক এবং অসাধারণ সামরিক শক্তিকে ভয় পেত আর মানুষের মোটের ওপর ধারণা এটিই ছিল যে, ইরাক হল পারস্য সাম্রাজ্যের রাজধানী আর তা হযরত খালেদ ব্যতিরেকে জয় করা সম্ভব নয়, তাই সবাই নিশ্চুপ থাকে। হযরত উমর কয়েকদিন পর্যন্ত নসীহত করেন, কিন্তু কোন প্রভাব পড়ে নি। অবশেষে চতুর্থ দিন তিনি এমন আবেগঘন বক্তৃতা করেন যে, উপস্থিত জনগণের হৃদয় কেঁপে ওঠে আর মানুষের উচ্ছ্বসিত ঈমানী চেতনা সামনে আসে এবং হযরত আবু উবায়েদ বিন মাসুদ সাকফী অগ্রসর হন আর 'আনা লে হাযা' অর্থাৎ 'আমি এর জন্য প্রস্তুত আছি'– এই নারা ধ্বনিত করেন এবং উক্ত জিহাদের জন্য নিজের নাম উপস্থাপন করেন। তারপর হযরত সা'দ বিন রবি এবং সালীদ বিন কায়েস এগিয়ে আসেন। তাদের সামনে আসতেই মুসলমানদের হৃদয়ে ঈমানী উচ্ছ্বাস সঞ্চারিত হয় আর তারা একান্ত উদ্দীপনার সাথে এগিয়ে এসে ইরাকের জিহাদের জন্য নিজেদের নাম উপস্থাপন করতে থাকে। পূর্বে ইরাকি সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ এর হাতে ছিল, কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) নিজের শেষ দিনগুলোতে সিরীয় যুদ্ধসমূহের গুরুত্বের প্রেক্ষিতে তাকে সিরিয়ায় যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর তখন ইরাকের ইসলামী বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন হযরত মুসান্না বিন

হারেসা। হযরত উমর (রা.) যখন মুসলমানদেরকে ইরাকের যুদ্ধের জন্য নিজেদের নাম উপস্থাপন করার আহ্বান জানাচ্ছিলেন তখন হযরত মুসান্না-ও মদিনায় অবস্থান করছিলেন। তিনিও একটি প্রাণোদ্দীপক বক্তৃতা করেন এবং বলেন, হে লোকসকল! এই রণাঙ্গনকে অনেক কঠিন ও ভারি মনে করো না। আমরা পারস্যবাসীদের সাথে যুদ্ধ করেছি এবং জয়লাভ করেছি। আর ইনশাআল্লাহ্ এর পরও বিজয় আমাদেরই হবে। মদিনা ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলো থেকে ইরাকি যুদ্ধসমূহে অংশগ্রহণের জন্য মুজাহিদদের সমন্বয়ে বাহিনী গঠিত হয়, অর্থাৎ এই সমস্ত বক্তৃতা শোনার পর। তাবারী ও বালাদেরি এই বাহিনীর সংখ্যা এক হাজার উল্লেখ করেছেন। আর 'আখবারুত্ তিওয়াল' পুস্তকের লেখক আল্লামা আবু হানিফা দেনা ভরি উক্ত সংখ্যা পাঁচ হাজার উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত এই বাহিনীর মদিনা থেকে যাত্রা করার সময় সংখ্যা এক হাজার ছিল, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছা পর্যন্ত উক্ত সংখ্যা পাঁচ হাজারে উপনীত হয়, কেননা বালাদেরি ও আবু হানিফা ব্যাখ্যা করেছেন যে, বাহিনীর আমীর পথে যেসব আরব গোত্রের পাশ দিয়ে যান, তাদেরকে বাহিনীতে যোগ দেয়ার জন্য আহ্বান জানান। এরপর এই প্রশ্নও ওঠে যে, এই সেনাবাহিনীর সেনাপ্রধান কে হবে? অর্থাৎ যদিও সেনাপ্রধান ছিলেন হযরত মুসান্না (রা.), কিন্তু নবগঠিত সেনাবাহিনীর সেনাপ্রধান কে হবে? হযরত উমর (রা.)-এর বিচক্ষণ দৃষ্টি আবু উবায়েদ সাকফীকে নির্বাচন করে। কারো কারো কাছে বিষয়টি অপছন্দনীয় ছিল যে, 'সাবেকূনাল আউয়ালূনা' তথা প্রাথমিক পর্যায়ের মুহাজের ও আনসার, যারা নিজেদের রক্ত দিয়ে ইসলাম নামক চারা গাছে জল সিঞ্চন করেছেন, তাদেরকে উপেক্ষা করে এমন একজনকে আমীর বা সেনাপ্রধান নির্বাচন করা হয়েছে যিনি পরবর্তী যুগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। হযরত উমর (রা.) বলেন, সাহাবীদের কোন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য যদি থেকে থাকে তবে তা কেবল এজন্য যে, তাঁরা (রা.) ইসলামের সেবায় অগ্রগামী ছিলেন আর ধর্মের প্রতিরক্ষায় অগ্রগামী হয়ে শত্রুর সাথে লড়াই করেছেন, কিন্তু এইক্ষণে পিছনে থেকে তাঁরা নিজেদের সেই অধিকার হারিয়েছেন। তাই এই পরিস্থিতিতে যে ব্যক্তি ইসলামের সুরক্ষার জন্য সর্বপ্রথম এগিয়ে এসেছে সে-ই নেতৃত্বের অধিকার রাখে। হযরত আবু উবায়েদ (রা.)-এর পর সা'দ বিন উবায়েদ এবং সালীদ বিন কায়েস ইরাকের যুদ্ধের জন্য হযরত উমর (রা.)-এর আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন। হযরত উমর (রা.) তাদের উভয়কে সম্বোধন করে বলেন, যদি তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দেয়ার ক্ষেত্রে অগ্রগামী থাকতে তাহলে ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামী হওয়ার কারণে আমি নেতৃত্বের এই দায়িত্ব তোমাদেরকেই দিতাম; যদিও সালীদ বিন কায়েসের ওপর আবু উবায়েদকে অগ্রাধিকার প্রদানের পেছনে উল্লিখিত প্রথম কারণটি ছাড়া হযরত উমর (রা.) এটিও বলেন যে, এই কাজটির জন্য একজন ধীর-স্থির প্রকৃতির মানুষের প্রয়োজন যে ধৈর্য-স্থৈর্য প্রদর্শন ও চিন্তাভাবনা করে যুদ্ধ পরিচালনা করবে, কিন্তু সালীদ বিন কায়েস রণাঙ্গনে আক্রমণ রচনায় অত্যন্ত ত্বরাপরায়ণ প্রমাণিত হয়েছেন। হযরত উমর (রা.) যদিও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আবু উবায়েদকে এই গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্বের ভার অর্পণ করেছিলেন, কিন্তু মহানবী (সা.)-এর প্রবীণ সাহাবীদের অতীতের অবদান ও বিগত দিনের অভিজ্ঞতাকেও উপেক্ষা করা সমীচীন ছিল না; তাই তিনি (রা.) হযরত উবায়েদ সাকফীকে জোর তাগিদও প্রদান করেছিলেন যে, তিনি যেন সাহাবীদের পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং ব্যবস্থাপনাগত বিষয়ে তাদের পরামর্শ অনুযায়ী চলেন। তাবারীর ইতিহাস গ্রন্থে এই পুরো ঘটনাটি রয়েছে, যেখান থেকে এই উদ্ধৃতিটি নেয়া হয়েছে।

হিজরী ১৩ সনে একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয় যা নামারিক ও কাসকার-এর যুদ্ধ নামে অভিহিত। হযরত আবু উবায়েদ সেনাবাহিনী নিয়ে যাত্রা করার পূর্বেই হযরত মুসান্না (রা.) হীরা নগরীতে গমন করেন। হীরা নগরী ছিল ইরাকের প্রাচীন আরব রাজত্বের রাজধানী। এটি ফোরাৎ নদীর পশ্চিম তীরে সেই স্থানে অবস্থিত ছিল যেখানে পরবর্তীতে কুফানগরী গড়ে উঠে। তিনি রীতিমত নিজ সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, কিন্তু অনতিকাল পরেই এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে, হযরত মুসান্না (রা.)-কে তাঁর গোটা সেনাবাহিনীসহ পিছু হটতে হয়। এর বিস্তারিত বিবরণ হল– ইরানি রাজদরবার নেতৃস্থানীয় ও আমীরদের পারস্পরিক মতানৈক্য ও বিবাদের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছিল। (সেখানে) নতুন এক শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে, যে ছিল খুরাসানের গভর্ণর ফররুখ যাযের পুত্র রুস্তম। ইরানি রাজদরবারের পক্ষ থেকে রুস্তমকে সবার নেতৃত্বের আসনে বসানো হয় আর সাম্রাজ্যের সকল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, যারা মতানৈক্য ও বিভেদের কারণে রাজ্যের শক্তিকে দুর্বল করার কারণে পরিণত হয়েছিল, এখন রুস্তমের অনুগত্য করতে থাকে। রুস্তম একজন বীর ও কুশলী ব্যক্তি ছিল। সে নেতৃত্ব গ্রহণ করা মাত্রই মুসলমানদের বিজিত এলাকায় তার কর্মকর্তাদের পাঠিয়ে বিদ্রোহ সৃষ্টি করে এবং ফোরাৎ সংলগ্ন জেলাসমূহে মুসলমানদের বিরুদ্ধে জনগণকে চরমভাবে উত্তেজিত করে এবং হযরত মুসান্নার মোকাবিলা করার জন্য একটি সেনাবাহিনী প্রেরণ করে। এই অবস্থাদৃষ্টে হযরত মুসান্না (রা.) কিছুটা পিছু হটাই সমীচীন মনে করেন এবং হীরা নগরী থেকে কুফার অনতিদূরে খাফফান নামক স্থানে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করেন। অপরদিকে রুস্তম সেনাতৎপরতা অব্যাহত রাখে। সে শক্তিশালী সেনাবাহিনী প্রস্তুত করে পৃথক পৃথক দুটি রাস্তায় মুসলমানদের ওপর হামলার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে। একটি

বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল জাবান; যা নামারিক নামক স্থানে ঘাঁটি করে (নামারিক ও ইরাকে কুফার নিকটস্থ একটি স্থান) এবং দ্বিতীয় সেনাদল নারসী'র নেতৃত্বে কাসকার অভিমুখে প্রেরণ করা হয়। কাসকার বাগদাদ এবং বসরার মাঝে দজলার পশ্চিম তীরস্থ একটি শহর, যার প্রভাবে মধ্যের শহর আবাদ ছিল। হযরত মুসান্না মদিনা থেকে সবে এক মাস পূর্বে এসেছিলেন, হযরত আবু উবায়েদ (রা.) মুজাহেদিনের সেনাদল নিয়ে তার সাথে খাফ্‌ফানে মিলিত হন। খাফ্‌ফান কুফার নিকটবর্তী একটি জায়গার নাম। আর কয়েক হাজার যোদ্ধা– সম্বলিত এই মুসলিম সেনাদল যুদ্ধক্ষেত্রে তখন গিয়ে উপনীত হয় যখন ইরাকের সার্বিক অবস্থা মুসলমানদের জন্য সুখকর ছিল না আর বিজিত জেলাসমূহ একটি একটি করে তাদের হস্তচ্যুত হচ্ছিল। হযরত আবু উবায়েদ (রা.) খাফ্‌ফানে সেনাদল একীভূত করার লক্ষ্যে কয়েকদিন অবস্থানের পর নামারিক-এর দিকে যাত্রা করেন। সেখানে দুর্ধর্ষ এক ইরানি সেনাদল যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ইরানি বর্ষীয়ান সেনাপতি জাবানের নেতৃত্বে শিবির স্থাপন করে রেখেছিল। হযরত আবু উবায়েদ (রা.) সেনাদল সুবিন্যস্ত করেন। অশ্বারোহী বাহিনীর নেতৃত্ব অর্পণ করেন হযরত মুসান্নার স্কন্ধে, ডানদিক আগলে রাখার জন্য নেতৃত্ব ওয়ালেক বিন জিদারা'কে দেন আর বামদিকের নেতৃত্বের জন্য আমর বিন হায়সাম'কে মনোনীত করেন। ইরানি সেনাদলের উভয় পাশের নেতৃত্ব আগলে রেখেছিল জুশনাদ মাআ এবং মারদান শাহ্। এই যুদ্ধে ইসলামী যে আদর্শ প্রদর্শিত হয় সে বিষয়ে মীর মাহমুদ আহমদ সাহেব তার মন্তব্যে বলেন, ইসলামী আদর্শের একটি দৃষ্টান্ত আমরা দেখি নামারিক নামক স্থানে, যেখানে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয় এবং ইরানি সেনাদল পরাজিত হয়। ইরানি সেনাদলের সেনাপতি জাবান'কে জীবিত গ্রেফতার করা হয় কিন্তু মাতার বিন ফিযাহ, যিনি জাবান'কে গ্রেফতার করেছিলেন, তাকে চিনতেন না। জাবান তার (অর্থাৎ মাতার বিন ফিযাহ'র) অপরিচিতির সুযোগ নিয়ে তাকে ফিদিয়া প্রদান করে ছাড়া পেয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর মুসলমানরা জাবান'কে পুনরায় গ্রেফতার করে হযরত আবু উবায়েদের কাছে নিয়ে এসে ইরানি সেনাদলে জাবানের মর্যাদা সম্পর্কে অবগত করে। কিন্তু এক ব্যক্তি, যাকে এক মুসলমান একবার ফিদিয়া গ্রহণ করে মুক্ত করে দিয়েছে, তাকে পুনরায় বন্দি করা হবে, হযরত আবু উবায়েদ (রা.) তা সহ্য করেন নি। মানুষ একই কথার পুনরাবৃত্তি করে যে, জাবান তো তাদের মাঝে বাদশাহ্‌স্বরূপ। তিনি বলেন, তবুও আমি চুক্তিভঙ্গ করতে পারি না। অতএব তাকে মুক্ত করে দেয়া হয়। এ ঘটনার মাধ্যমে ইসলামী বাহিনীর সেই আচরণবিধির ওপর আলোকপাত হয় যা তাদের জন্য নির্ধারিত ছিল। আর বুঝা যায় যে, মুসলমানরা যুদ্ধগত স্বার্থসিদ্ধি করার সুবর্ণ সুযোগ হাতে আসার পরও নৈতিক আদর্শকে নিজেদের হাতছাড়া হতে দিতেন না।

এরপর সাকাতিয়া যুদ্ধাভিযান যেটি তেরো হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল। নামারেক যুদ্ধাভিযানে পরাভূত হয়ে ইরানি সেনাদল কাস্‌কারের দিকে চলে যায় যেখানে পূর্বেই ইরানি সেনাপতি নারসী একদল সৈন্যসহ মুসলমানদের মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত ছিল। আবু উবায়েদ (রা.) তার মোকাবিলা করার লক্ষ্যে কাস্‌কারের দিকে অগ্রসর হন। কাস্‌কারে অবস্থানরত ইরানি সেনাপতি নারসী ইরানি-ইরাকি সম্রাজ্যে বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিল। সে-ও তার সেনাদলের উভয় বাহুর সেনাপতি বিন্দাবিয়া এবং তিরাবিয়াসাসানী বাদশাহ্‌দের নিকটাত্মীয় ছিল। ইরানি দরবারে নামারেকের পরাজয়ের সংবাদ পৌঁছলে রুস্তম নারসীর জন্য অধিক সেনাবল প্রেরণের বন্দোবস্ত করছিল। তখন হযরত আবু উবায়েদ (রা.) নিজ সেনাদলের গতিবৃদ্ধি করে নারসীর সেনাদলের কাছে তাদের সহায়তাকারী সেনাদল আসার পূর্বেই কাস্‌কারের নিম্নাঞ্চলে গিয়ে তাদের ওপর আক্রমণ করেন। আর সাকাতিয়া নামক প্রসিদ্ধ ময়দানে এক দুর্দান্ত যুদ্ধাভিযানের পর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মুসলমানরা জয়যুক্ত হয়। বড় যুদ্ধাভিযানের পর হযরত আবু উবায়েদ (রা.) কাসকারের আশপাশের এলাকায় সংঘবদ্ধ শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য ইসলামী ক্ষুদ্র সেনাদলও পাঠানো শুরু করেন।

এরপর রয়েছে বারুসামা যুদ্ধাভিযান। এটিও তেরো হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল। কাসকার ও সাকাতিয়ার মাঝে একটি জায়গার নাম ছিল বারুসামা, যেখানে ইরানি সেনাপতি জালিনুসের সাথে সংঘর্ষ হয় যে প্রকৃতপক্ষে জাবানের সাহায্যার্থে এসেছিল। নারসির সাহায্য চেয়ে রুস্তম ইরানের কমাণ্ডারের নেতৃত্বে একটি সৈন্যবাহিনী কাসকার অভিমুখে প্রেরণ করেছিল। আবু উবায়েদ পূর্বেই এই সংবাদ পেয়ে গিয়েছিলেন আর তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে জালিনুসের সৈন্যবাহিনী আসার পূর্বেই নারসির সৈন্যবাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং তাকে পরাজিত করার মাধ্যমে শত্রুবাহিনীর সামরিক শক্তিকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছিলেন। জালিনুস তখন বারুসামা এলাকার বাকুসিয়াসা নামক স্থানে সৈন্যবাহিনী নিয়ে পৌঁছে। বসরা এবং কুফার মধ্যবর্তী জনপদকে সাওয়াত বলা হত আর বারুসামা ও বাকুসিয়াসা এই জনপদগুলির মাঝে দুটি জনবসতি। আবু উবায়েদ বাকুসিয়াসা পৌঁছে যান এবং সংক্ষিপ্ত যুদ্ধের পর ইরানি সৈন্যবাহিনী পরাস্ত হয় আর জালিনুস যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যায়। আবু উবায়েদ সেখানে অবস্থান করে আশপাশের সকল এলাকা নিজের আয়ত্তে নিয়ে নেন। এটি ঐতিহাসিক তাবারীর বর্ণনা। বালাদেরি লিখেছেন যে, জালিনুসের সাথে সন্ধি হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য পরবর্তী ঐতিহাসিকগণের মধ্যে ইবনে খলদুন এবং ইবনে আসীর তাবারীর সমর্থন করেছেন।

জিসারের যুদ্ধের বর্ণনা কিছুদিন পূর্বে করা হয়েছিল আর এখানেও এটি বর্ণনা করা জরুরী বিধায় বলে দিচ্ছি। জিসারের যুদ্ধ ১৩ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল। ফোরাত নদীর তীরে মুসলমান এবং ইরানিদের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল। মুসলমানদের পক্ষ থেকে সেনাপ্রধান ছিলেন হযরত আবু উবায়েদ সাকফী (রা.) এবং ইরানিদের সেনাপতি ছিল বাহমান জাযভিয়া। মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা ছিল ১০ হাজার। পক্ষান্তরে ইরানি সৈন্যবাহিনী ছিল ৩০ হাজার এবং তাদের কাছে ছিল ৩০০ হাতি। ফোরাত নদী মাঝখানে প্রতিবন্ধক হওয়াতে দুইপক্ষের মধ্যে কিছুদিন যুদ্ধ হয় নি। অতঃপর উভয়পক্ষের পারস্পরিক সম্মতিতে নদীর উপর জিসার অর্থাৎ একটি পুল বানানো হয় আর এই পুলের কারণে এই যুদ্ধকে জিসারের যুদ্ধ বলা হয়। পুল নির্মিত হলে বাহমান জাযভিয়া হযরত আবু উবায়েদ (রা.)-কে সংবাদ প্রেরণ করে যে, এখন তুমি নদী অতিক্রম করে আসবে নাকি আমাদেরকে অতিক্রম করার অনুমতি প্রদান করবে? হযরত আবু উবায়েদ (রা.)-চাইতেন যে, মুসলমান সৈন্যরা নদী অতিক্রম করে বিরুদ্ধবাদীদের সাথে যুদ্ধ করবে যদিও সেনাপতি হযরত সালীদ (রা.) ভিন্নমত পোষণ করেন। হযরত আবু উবায়েদ ফোরাত নদী পার হয়ে পারস্য বাহিনীর উপর আক্রমণ করেন। কিছু সময় পর্যন্ত এভাবেই যুদ্ধ চলতে থাকে। কিছুক্ষণ পর বাহমান জাযভিয়া নিজ সৈন্যবাহিনীকে বিক্ষিপ্ত হতে দেখে হাতিগুলোকে সামনে নিয়ে আসার নির্দেশ দেয়। হাতিগুলো অগ্রসর হওয়ার কারণে মুসলমানদের সারির শৃঙ্খলা ভেঙে যায় এবং মুসলমান সৈন্যবাহিনী বিশৃঙ্খল হয়ে যেতে থাকে। হযরত আবু উবায়েদ (রা.) মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলেন, হে আল্লাহ্‌র বান্দারা! তোমরা হাতির উপর আক্রমণ চালাও এবং তাদের শুঁড়গুলো কেটে ফেল। হযরত আবু উবায়েদ একথা বলে নিজে সামনে অগ্রসর হন এবং এক হাত দিয়ে আক্রমণ করে একটি শুঁড় কেটে ফেলেন। অন্যান্য সৈন্যরা এটি দেখে ক্ষিপ্রতার সাথে যুদ্ধ আরম্ভ করে এবং অনেকগুলো হাতির শুঁড় ও পা কেটে দিয়ে সেগুলোর আরোহীদের হত্যা করে। দৈবক্রমে হযরত আবু উবায়েদ একটি হাতির সামনে পড়ে যান। তিনি হাতির উপর আক্রমণ করে শুঁড় কেটে ফেলেন, কিন্তু নিজে সেটির পায়ের নিচে পড়ে যান এবং পিষ্ট হয়ে শহীদ হন।

তাবারীর ইতিহাসগ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে, হযরত আবু উবায়েদ (রা.)-এর স্ত্রী দুমাহ্ যুদ্ধের পূর্বে একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, এক ব্যক্তি আকাশ থেকে একটি পাত্রে জান্নাতের শরবত নিয়ে এসেছে, যা হযরত আবু উবায়েদ এবং জাবার বিন আবু উবায়েদ পান করেন। একইভাবে তাদের পরিবারের আরো কিছু সদস্য তা পান করেন। দুমাহ্ এই স্বপ্নের কথা তার স্বামীর কাছে বর্ণনা করেন। হযরত আবু উবায়েদ (রা.) বলেন, এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা হল শাহাদত। এরপর হযরত আবু উবায়েদ (রা.) মানুষের কাছে ওসীয়্যত করে যান যে, আমি যদি শহীদ হই তবে জাবার যুদ্ধের নেতৃত্ব দিবে, সে যদি শহীদ হয় তবে অমুক অমুক ব্যক্তি সেনাপতি নিযুক্ত হবে। অতএব সেই স্বপ্নের মধ্যে যারা শরবত পান করেছিল তাদেরকে হযরত আবু উবায়েদ (রা.) সেই ক্রম অনুসারে সেনাপতি নিযুক্ত করেন। অতঃপর তিনি (রা.) বলেন, যদি আবুল কাশেমও শহীদ হয়ে যায় তাহলে হযরত মুসান্না তোমাদের সেনাপতি হবেন। দুমাহ্‌র এ স্বপ্ন অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়। এ যুদ্ধে হযরত আবু উবায়েদের পর পর্যায়ক্রমে বর্ণিত ছয় ব্যক্তি একে একে নেতৃত্বের পতাকা হাতে নিতে থাকেন এবং শহীদ হতে থাকেন। অষ্টম ব্যক্তি ছিলেন হযরত মুসান্না যিনি ইসলামী পতাকা নিয়ে পুনরায় পূর্ণ উদ্যমে আক্রমণের সংকল্প করেন। কিন্তু ইসলামী সৈন্যদের সারি বিশৃঙ্খল হয়ে গিয়েছিল আর মানুষ ক্রমাগত সাতজন সেনাপতিকে শহীদ হতে দেখে পালাতে আরম্ভ করেছিল, কয়েকজন নদীতে লাফিয়ে পড়ে। হযরত মুসান্না এবং তার সঙ্গীগণ বীরত্বের সাথে লড়তে থাকেন। পরিশেষে হযরত মুসান্না আহত হন এবং তিনি লড়াই করতে করতে ফোরাত নদী পার হয়ে ফেরত চলে আসেন। এ ঘটনায় মুসলমানদের ব্যাপক ক্ষতি হয়। মুসলমানদের চার হাজার লোক শহীদ হয়, অপরদিকে ইরানিদের ছয় হাজার সৈন্য নিহত হয়। এ পরাজয় মুসলমানদের জন্য দীর্ঘমেয়াদী ক্ষয়ক্ষতির কারণ হতে পারত, কিন্তু সৌভাগ্যজনকভাবে এমন অলৌকিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে, শত্রুরা মুসলমানদের পিছু ধাওয়া করতে পারে নি। কেননা ইরানি সাম্রাজ্যগুলোতে অভ্যন্তরীণ বিরোধ সৃষ্টি হওয়াতে বাহমান জাযভিয়াকে ফেরত যেতে হয়। এর কারণ সম্পর্কে ইবনে আসীর লিখেন যে, স্বয়ং ইরানের রাজধানী মাদায়েনে পারস্য সাম্রাজ্যের এক ব্যক্তি রুস্তমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) জিসারের যুদ্ধ সম্পর্কে কিছু বর্ণনা করেছেন:

জিসারের যুদ্ধে মুসলমানদের সবচেয়ে বড় এবং ভয়াবহ পরাজয় বরণ করতে হয়। ইরানিদের মোকাবিলার জন্য মুসলমানদের বিশাল সৈন্যবাহিনী গিয়েছিল। ইরানি সেনাপতি নদীর অপর তীরে সেনাব্যূহ স্থাপন করে এবং তাদের জন্য অপেক্ষা করে। ইসলামী সেনাবাহিনী পূর্ণ উদ্যমে তাদের ওপর আক্রমণ করে এবং তাদেরকে পিছু হটিয়ে সামনে এগিয়ে যায়। কিন্তু এটি ইরানি সেনাপতির রণকৌশল ছিল। সে একপাশ দিয়ে একটি সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করে পুল দখল করে নেয় এবং মুসলমানদের ওপর তীব্র আঘাত হানে। মুসলমানরা বাধ্য হয়ে পিছু হটে, কিন্তু দেখতে পায় যে, শত্রুরা

পুল দখল করে নিয়েছে। তারা দিশেহারা হয়ে অন্য দিকে সরে যায়। তখন শত্রুরা তীব্র আঘাত হানে আর মুসলমানদের সিংহভাগ নিরুপায় হয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং নিহত হয়। মুসলমানদের এ ক্ষয়ক্ষতি এত ব্যাপক ছিল যে, মদিনাও এতে প্রকম্পিত হয়। হযরত উমর (রা.) মদিনাবাসীদের একত্র করে বলেন, এখন মদিনা ও ইরানের মাঝে কোন প্রতিবন্ধক অবশিষ্ট নেই। মদিনা সম্পূর্ণ অরক্ষিত আর সম্ভবত শত্রুরা কিছুদিনের মধ্যেই এখানে পৌঁছে যাবে। এজন্য আমি নিজে সেনাপতি হয়ে যেতে চাই। বাকি লোকেরা এ সিদ্ধান্ত পছন্দ করে, কিন্তু হযরত আলী বলেন, যদি আল্লাহ্ না করুন, আপনার কিছু হয়ে যায়, তবে মুসলমানগণ বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং তাদের শৃঙ্খলা ও ঐক্য বিনষ্ট হবে। তাই আপনি স্বয়ং না গিয়ে অন্য কাউকে পাঠানো সমীচীন হবে। তখন হযরত উমর হযরত সা'দকে, যিনি সিরিয়ায় রোমীয়দের সাথে যুদ্ধে নিয়োজিত ছিলেন, লিখেন যে, তুমি যতটা পার সৈন্য পাঠিয়ে দাও, কেননা এখন মদিনা সম্পূর্ণ অরক্ষিত হয়ে গেছে। শীঘ্রই সৈন্যবাহিনীকে যদি প্রতিহত না করা হয় তাহলে তারা মদিনা দখল করে নিবে।

এই যে স্মৃতিচারণ চলছে, এর ধারা পরবর্তীতেও অব্যাহত থাকবে, ইনশাআল্লাহ্। এটি যুদ্ধ-সংক্রান্ত বর্ণনা ছিল, এর আরো বিস্তারিত এবং বাকি যুদ্ধগুলোরও বিস্তারিত পরবর্তীতে বর্ণনা করা হবে।

এখন আমি কয়েকজন প্রয়াত ব্যক্তিরও স্মৃতিচারণ করতে চাই যাদের জানাযাও পড়াব, ইনশাআল্লাহ্। এদের মধ্যে প্রথমটি হল ফাতহি আব্দুস্ সালাম সাহেবের; তার পুরো নাম ফাতহি আব্দুস সালাম মুবারক সাহেব। তিনি মিশরের বাসিন্দা ছিলেন। সম্প্রতি তিনি ৭৫ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ তার পিতা নকশবন্দী তরিকার অনুসারী ছিলেন। তিনি তার এক সন্তানকে ধর্মীয় শিক্ষার জন্য ওয়াক্‌ফ করার সংকল্প করেন এবং একাজের জন্য ফাতহি সাহেবকে বেছে নেয়া হয়। ফাতহি সাহেব দশ বছর বয়সেই পবিত্র কুরআন হিফয সম্পন্ন করেন। পবিত্র কুরআনের প্রতি গভীর ভালবাসার কারণে ফাতহি সাহেবের পিতাও তার সাথে পবিত্র কুরআন হিফয করা আরম্ভ করেন এবং পুরো কুরআন হিফয করেন। পরবর্তীতে আল্লাহ্‌র এমনই কৃপা হয় যে, তার পিতা ৮৮ বছর বয়সে বয়আতও করে নেন। পবিত্র কুরআন হিফয করার পর ফাতহি সাহেব আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন এক উচ্চ বিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সাথে পড়ালেখা সম্পন্ন করেন। এরপর তিনি কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকৌশল বিদ্যায় ডিগ্রি অর্জন করেন। ছাত্রজীবনে অধ্যয়নের প্রতি পরম আগ্রহের কারণে নিজের পকেটখরচ থেকে অল্প অল্প করে টাকা জমিয়ে বইপুস্তক ক্রয় করতেন এবং অধ্যয়ন করতেন। এরপর তিনি মিশরের বিমানবাহিনীতে অফিসার নিযুক্ত হন। বিমানবাহিনীতে তার বিরুদ্ধে এই অপবাদ আরোপ করা হয় যে, তিনি কতিপয় বৈপ্লবিক সংগঠনের গোপন ষড়যন্ত্রে জড়িত আছেন অথচ তিনি এসবের বিরোধী ছিলেন এবং তাদের সংশোধনের জন্য সচেষ্ট ছিলেন। যাহোক, এই অভিযোগে কিছুকাল কারাভোগের পর তাকে নির্দোষ সাব্যস্ত করা হয়। এরপর তিনি ইরাক চলে যান। কিছুকাল সেখানে প্রকৌশলী হিসেবে কাজ করেন। ১৯৯১ সনে ইরাক যুদ্ধের সময় তিনি খুবই ভয়ঙ্কর সময় অতিবাহিত করেন; যে অঞ্চলে তিনি বসবাস করতেন সেখানে একরাতেই দশটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। তিনি নিজ পরিবারসহ দোয়ায়রত থাকেন এবং আল্লাহ্ তা'লা আশ্চর্যজনকভাবে তাদেরকে রক্ষা করেন। এরপর তিনি জর্ডানে চলে আসেন এবং মু'তাযিলা ফিরকার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন। এরপর মিশরে আসেন, সে সময় তিনি আহলে কুরআন ফির্কার প্রতি কিছুটা আকৃষ্ট ছিলেন; এরই মধ্যে আহমদীয়া জামা'ত সম্পর্কে জানতে পারেন। আহমদীয়াতের মাঝে তিনি সব উদ্বেগজনক সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়ার ফলে বয়আত করে নেন। ফাতহি সাহেব নিজেই তার বয়আত গ্রহণের ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেন যে, ১৯৯৫ সালে মিশরে ইবনে খালদূন নামক একটি জ্ঞানকেন্দ্রে বিভিন্ন বক্তৃতা হত, সেখানে আমারও অনেকবার বক্তৃতা দেয়ার এবং বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্নেরও উত্তর দেয়ার সুযোগ হয়েছে। ১৯৯৮ সালে মোকাররম মোস্তফা সাবেত সাহেব এই পাঠকেন্দ্রে আমার বক্তৃতা শুনে ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেন। তার বাড়িতে আমাকে তিন ঘণ্টার একটি ভিডিও ক্যাসেট দেখানো হয়। এই ভিডিওতে মোকাররম মরহুম হিলমী আশ-শাফি সাহেব দাজ্জাল সম্পর্কে হাদীসে উল্লিখিত বিভিন্ন বিষয়ের এমন ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন যা আমার খুবই পছন্দ হয়। ফাতহি সাহেব বলেন, আমার জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে মরহুম মোস্তফা সাবেত সাহেব বলেন, এটি হল দাজ্জালবধকারী প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র তফসীর। তিনি বলেন, ১৯৯৯ সনে মোস্তফা সাবেত সাহেব আমাকে ইসলামী নীতি দর্শন পুস্তক প্রদান করেন যা আমার মাঝে এক অদ্ভুত আলোড়ন সৃষ্টি করে, আর আমি ইমাম মাহদী সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে গবেষণা করার সিদ্ধান্ত নিই। আমি আমার ব্যক্তিগত গবেষণায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত ছিলাম যে, নাসেখ-মনসুখ সংক্রান্ত বিশ্বাস ভ্রান্ত এবং এটি পবিত্র কুরআনের সম্মানের পরিপন্থী। তাছাড়া আমি ধর্মীয় স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলাম। আহমদীয়াতের বিষয়ে যখন গবেষণা শুরু করলাম তখন দেখলাম–আহমদীয়াত তো একই বিষয় প্রচার করছে! এরপর পবিত্র কুরআনের কতিপয় আয়াত সম্পর্কে আমি জানতে চাইলে মোস্তফা সাবেত সাহেব আমাকে

Five volume commentary দিয়ে বলেন, এতে আপনার সব প্রশ্নের উত্তর আছে। আমি দেখলাম, এতে আমার সকল প্রশ্নের উত্তর আমারই চিন্তাধারা অনুযায়ী এবং আমি যেমনটি আশা করেছিলাম–হুবহু তেমনিভাবে বিদ্যমান রয়েছে। ফাতহি সাহেব বলেন, আমি অনেক চিন্তাভাবনা করলাম; ঐশী ওহী লাভের মিথ্যা দাবি করা তো নিঃসন্দেহে মহাপাপ, কিন্তু যে সব বিষয় নিয়ে ইমাম মাহদী (আ.) এসেছেন সেগুলো সবই সত্য, হেদায়েত ও আধ্যাত্মিকতা সম্বলিত বিষয়। দু'একটি বিচ্ছিন্ন বিষয় তো যে কেউই বলে দিতে পারে, কিন্তু এত এত সত্য তত্ত্বজ্ঞান, তা-ও আবার এত ব্যাপক সংখ্যায়–এমনটি তো এই পুরো শতাব্দীতে কাউকে আল্লাহ্ তা'লা প্রদান করেন নি! তবে কি আল্লাহ্ তা'লা এই মহান পুরস্কারে এমন এক ব্যক্তিকে ভূষিত করেছেন যে ব্যক্তি মহা অন্যায় করত ঐশী ওহী লাভের দাবি করেছে! তিনি বলেন, অবশেষে দোয়ার মাধ্যমে, পড়াশোনা ও চিন্তাভাবনা করে ২০০১ সালে মোস্তফা সাবেত সাহেব যখন মিশর আসেন তখন আমি তাকে বললাম, আমি ইমাম মাহদী (আ.)-এর প্রতি ঈমান এনেছি। আবেগের আতিশয্যে এক মুহূর্তের জন্য তিনি আমার কথা বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না। এরপর আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আরবী রচনাবলী অধ্যয়ন আরম্ভ করি, আর সেগুলো তথ্য ও তত্ত্বের এক উত্তাল মহাসমুদ্র হিসেবে আমার সামনে উদ্ভাসিত হয়।

জামা'তের জন্য ফাতহি সাহেবের জ্ঞান ও সাহিত্য সংক্রান্ত সেবাসমূহ নিম্নরূপ- ২০০৫ সালে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) কর্তৃক প্রণীত পুস্তক 'হায়াতে মুহাম্মদ (সা.)'-এর ইংরেজি অনুবাদ Life of Muhammad তিনি আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। 'আল-হিওয়ারুল মুবাশের' অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতেন এবং অত্যন্ত আবেগ-উচ্ছ্বাসের সাথে যুক্তিপূর্ণ ও বিস্তারিত উত্তর দিতেন যা দর্শকরা খুবই উপভোগ করত। মিশরের একজন খিষ্টান পাদ্রী কুরআন শরীফের ওপর আপত্তিমূলক ধারাবাহিক অনুষ্ঠান করে, যার নাম ছিল 'হালিল কুরআনু কালামুল্লাহ্' অর্থাৎ 'কুরআন কি আল্লাহ্‌র বাণী?'–এর উত্তরে ফাতিহ সাহেব ২০০৬ সালে ধারাবাহিক কয়েকটি অনুষ্ঠান রেকর্ড করান যার নাম ছিল 'নাআম- ইন্নাহু কালামুল্লাহ্' অর্থাৎ 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই এটি আল্লাহ্‌রই বাণী'। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আরবী কাসিদাসমূহের ব্যাখ্যা সম্বলিত অনুষ্ঠান 'রূহুল কুদুস' করেন, যেখানে কবিতাগুলোর শব্দগত ও অর্থগত নিদর্শন খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেন। এছাড়াও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি নিয়মিত অংশগ্রহণ করেছেন যার মধ্যে 'নবুওয়াতুন তাহাক্কাকাত' অর্থাৎ ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ যা সত্য প্রমাণিত হয়েছে, বারাহীনে আহমদীয়ার তত্ত্বজ্ঞান ফী সামাওয়াতিল কুরআন, ইসলামের ইতিহাস ও খাতামুন্নাবীঈন প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া তিনি জামা'তেরও বিভিন্ন সেবা করেছেন। স্থানীয় জামা'তে এক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সেক্রেটারী তবলীগ হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি ওয়াকফে আরযীও করেছেন; কয়েক বছর তিনি ওয়াকেফে যিন্দেগী হিসেবে জামা'তের কাজ করেছেন। জামা'তের নামায সেন্টারে দরসও প্রদান করতেন। তার পুত্র ইব্রাহীম ফাতহি সাহেব বলেন, মরহুম আব্বাজান সূরা ফাতিহার আলোকে সত্য জীবন যাপনকারী মানুষ ছিলেন; তার জীবন খিলাফতরূপী নিয়ামতের জ্যোতিতে জ্যোতির্মণ্ডিত ছিল। যুগ-খলীফার জন্য ভালবাসা ও শ্রদ্ধার আশ্চর্য আবেগ রাখতেন। তার মতে, সকল সমস্যার সমাধান এবং যাবতীয় বিষয় ও সমস্যাবলী বুঝার ও আল্লাহ্ তা'লার পানে যাওয়ার পথ চেনার কেবল একটিই পদ্ধতি রয়েছে, আর তা হল খিলাফত। তিনি লেখেন, শ্রদ্ধেয় পিতা কথায় ও কাজে পরিপূর্ণ সত্য অবলম্বনের জন্য সুপরিচিত ছিলেন। প্রত্যেক কাজের পূর্বে সবসময় দোয়া করতেন এবং খোদা তা'লার নিকট কেঁদে-কেঁদে সাহায্য প্রার্থনা করতেন। যদি কেউ তাকে বলত, আমাকে উপদেশ দিন, তাহলে তাকে বলতেন, দোয়া কর এবং আল্লাহ্ তা'লার কাছে সিরাতে মুস্তাকীম (সঠিক পথ)-এর দিশা যাচনা কর, আর যুগ-খলীফার কাছে দোয়ার জন্য লেখ। তিনি গভীর পাণ্ডিত্য ও বিস্তৃত জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন; বিস্তর পড়াশোনা ছিল তার। সবরকম পুস্তকাদি পড়তেন এবং নতুন নতুন চিন্তাধারা ও আধুনিক গবেষণা বুঝার চেষ্টায় রত থাকতেন। অধ্যয়নের নির্যাস ধর্মীয় সূক্ষ্ম বিষয়াদি বুঝার ও বুঝানোর কাজে ব্যয় করতেন। পঠন-পাঠনে তার রীতি খুবই সুন্দর ছিল, পাঠদানের সময় কখনও কখনও তিনি হাস্যরসও করতেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর রচনাবলী সবসময় পড়তেন এবং তা থেকে তত্ত্বজ্ঞানের মণিমাণিক্য উদ্ঘাটন করে সেগুলো নিজের দৈনন্দিন জীবনে আলোকবর্তিকারূপে গ্রহণ করতেন। জুমুআর দিন নিজের বক্তৃতায় ও MTA-র অনুষ্ঠানসমূহে এসব তত্ত্বজ্ঞান বর্ণনা করতেন। ধর্মসেবার গভীর আবেগ রাখতেন। তিনি আরও বলেন, অসুস্থ হয়ে যখন হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন তখন শ্বাসকষ্ট সত্ত্বেও নার্সদেরকে আহমদীয়াতের তবলীগ করতে থাকেন। মানুষজনকে যেসব উত্তম চারিত্রিক আদর্শের উপদেশ দিতেন, বাড়িতে নিজে সেগুলো পালন করে দেখাতেন। স্বাচ্ছন্দ্য ও কাঠিন্য–উভয় অবস্থাতেই তাকওয়া ও সত্যবাদিতাকে আঁকড়ে ধরে রেখেছেন। আল্লাহ্ তা'লার সাথে সাক্ষাতের তার গভীর আকাঙ্ক্ষা ছিল। প্রায়শ বলতেন, এই পৃথিবীর কোন মূল্যই নেই; এই পৃথিবীতে পরকালের জন্য প্রস্তুতি নেয়ার মাঝেই প্রকৃত মুক্তি নিহিত।

অধিকাংশ সময় খোদা তা'লার সাক্ষাৎলাভের বাসনার কথা বলতেন। তার পুত্র বলেন, অন্তিম দিনগুলোতে

আমাকে কখনও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখলে বলতেন, আমার পাশে বসে সূরা ফাতিহা ও বারবার দরূদ শরীফ পাঠ কর, কেননা কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'লার আদেশেই রোগ থেকে মুক্তিলাভ হয়; কেবল তিনিই সঠিক ঔষধের জ্ঞান রাখেন। তাঁর আদেশ ছাড়া চিকিৎসা কিছুই করতে পারে না। আমি পৃথিবীর কোন পরোয়া করি না, বরং আমি খোদা তা'লার সাক্ষাৎলাভের আকাঙ্ক্ষী। তার ছেলে লিখেন, আমার মা বলেন, আমার স্বামী সর্বদা জামা'তের সেবাকে সকল কাজের ওপর প্রাধান্য দিতেন। বেশিরভাগ সময় তবলীগি কাজে ঘরের বাহিরে কাটাতেন। এরই কল্যাণে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সন্তানদের অলৌকিকভাবে সুরক্ষা করতেন।

ডাক্তার হাতেম হিলমি শাফি সাহেব লিখেন, আমাদের ভাই এবং শিক্ষক মোকাররম ফাতহি আবদুস সালাম সাহেব সত্যিই সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, মু'মিনদের মাঝে এমন কিছু মানুষ রয়েছে যারা আল্লাহ্ তা'লার সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে। ডাক্তার হাতেম সাহেব বলেন, তার বয়আত থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাকে একজন বিস্ময়কর মানুষরূপে দেখেছি। তার মাঝে আল্লাহ্ তা'লার সত্তা, গুণাবলী এবং একত্ববাদের প্রতি ভালবাসার এক নেশা ছিল। তিনি মহানবী (সা.) এবং পবিত্র কুরআনের প্রেমিক ছিলেন। সূরা ফাতিহার ভালবাসায় মগ্ন ছিলেন। তার মূল্যবান দরসসমূহে তাকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সূরা ফাতিহার তফসীরের গগনে বিচরণ করতে দেখা যেত।

জর্ডানের হোসেন আল মিশরী সাহেব লিখেন, ফাতহি সাহেব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এবং কাদিয়ানের প্রতি গভীর ভালবাসা রাখতেন। খিলাফতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখতেন, অনেক জ্ঞানী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি তার একটি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন যে, ২০১৮ সালের কাদিয়ান জলসায় তারা এক সাথে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি বলেন, যখন আমি কাদিয়ান পৌঁছাই তখন আমাকে সারায়ে ওয়াসীমে থাকতে দেয়া হয়। সেখানে ফাতহি সাহেব আমার সাথে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে সাক্ষাৎ করেন। জলসার অধিবেশন শেষে রাতে তিনি আমার সাথে বারাহীনে আহমদীয়ার আলোচনা শুরু করতেন। তিনি কাদিয়ানের প্রেমিক ছিলেন। কাদিয়ান সম্পর্কে তিনি বলতেন, এটি আমাদের প্রিয়ের প্রিয় গ্রাম। আমরা একসাথে কাদিয়ানের পবিত্র স্থানসমূহ ঘুরে দেখি। তিনি বলেন, আমি অবাক হয়েছি, ফাতহি সাহেব সকল জায়গার ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান রাখতেন! তার কাদিয়ান থেকে বিদায়ের দিন আমরা ফজরের নামাযের পর বায়তুয্ যিকর ও বায়তুদ্ দোয়ায় যাই। সেখানে তার বিগলিত চিত্তে দোয়া দেখে আমিও নিজেকে সামলাতে পারি নি। সেখান থেকে বের হয়ে আমরা যখন বেহেশতি মাকবেরার চত্তরে পৌঁছি তখন তিনি অবাক দৃষ্টিতে এদিকসেদিক তাকাচ্ছিলেন। কিছুক্ষণ পর আমি যখন তাকে কারণ জিজ্ঞেস করি তখন তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকেন এবং এরপর মাটিতে সিজদায় লুটিয়ে পড়েন। সিজদা থেকে উঠে আকাশের দিকে হাত উঠিয়ে কম্পিত কণ্ঠে বলেন, হে খোদা! তুমি জান, আমার প্রিয়ের সাহচর্যে থাকা আমার কাছে কতটা প্রিয়। হে খোদা! তুমি জান, আমি আজ রাত এখানেই কাটাতে চাই। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই যে আমাদের বিদায় মুহূর্ত। আসলে এঘটনার দিন তাকে সংবাদ দেয়া হয়েছিল যে, সেদিনই ফিরে যেতে হবে। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্! তুমি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। সকল কাজ তোমারই কর্তৃত্বে রয়েছে এবং তোমার আদেশেই সব সংঘটিত হয় আর আইন প্রতিষ্ঠিত থাকে ও পরিবর্তিত হয়। আমার আজকের সফর স্থগিত করে দাও, যাতে আরো কয়েক ঘণ্টা আমার চোখের প্রশান্তি লাভ হয়। যাহোক, যা ঘটেছে তা হল, গাড়ি আসে আর ফাতহি সাহেবের জিনিসপত্র গাড়িতে রাখা হয়। আসলে তাকে বলা হয়েছিল যে, সেদিন তার সিট বুক করা হয়েছে। স্বল্পক্ষণ পর সারায়ে ওয়াসীমে ফাতহি সাহেবের আওয়াজ শুনতে পাই, তিনি বলছিলেন, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। তিনি বলেন, আমার দয়ালু খোদা আমার দোয়া শুনেছেন আর আমার সফর স্থগিত করে দিয়েছেন। তিনি আল্লাহ্ তা'লার গুণকীর্তনে ব্যস্ত ছিলেন। আমি নিচে নেমে এলে ফাতহি সাহেব আমাকে জড়িয়ে ধরে বলেন, আপনি দেখেছেন! আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে আমাদের প্রিয় মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বরকতে আমাদের দোয়া কবুল করেছেন আর আশ্চর্যজনকভাবে তিনি কবুল করেন! এরপর তার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে যায় আর এ অবস্থা দেখে আমার চোখও অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। তিনি বলেন, আজকে আমার ফ্লাইট–এটি ব্যবস্থাপকদের ভুল হয়েছিল, আসলে সেটি আজ নয় বরং আগামীকাল বা অন্য কোন দিন ছিল। তিনি বলেন, তিনি তার মৃত্যু সম্পর্কেও জেনে গিয়েছিলেন আর এটি তিনি হোসেন সাহেবকে জানিয়েছিলেন। এছাড়া MTA-এর জন্য তিনি যে প্রোগ্রাম বানাচ্ছিলেন সেটি কীভাবে বানাতে হবে এর জন্য দিকনির্দেশনাও প্রদান করেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি একটি এলহাম হয়েছিল আর তা হল 'ইয়াদঊনা লাকা আবদালুশ্ শামে ওয়া ইবাদুল্লাহে মিনাল আরাব' অর্থাৎ সিরিয়ার পুণ্যবান লোকেরা এবং আরবের অধিবাসী খোদার বান্দারা তোমার জন্য দোয়া করে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) লিখেছেন, আল্লাহ্ তা'লাই ভাল জানেন এটি কী বিষয় আর কখন কীভাবে এটি প্রকাশ পাবে। বাকিটা আল্লাহ্-ই ভাল জানেন, কিন্তু আমরা বাস্তবেই দেখছি, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আরবের যেসব স্থানে জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে তাদের মাঝেও, আর আমি এখন ফাতহি সাহেবের যে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন

করলাম তা থেকেও প্রতীয়মান হয় যে, আরবদের মাঝে আশ্চর্যজনকভাবে আল্লাহ্ তা'লা নিষ্ঠাবান লোকদের সৃষ্টি করছেন, যারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ করে এবং প্রেম, প্রীতি ও ভালবাসার বহিঃপ্রকাশও ঘটায়। একথার সাক্ষ্য দিয়ে হাতেম সাহেবও লিখেন যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এবং তাঁর বইপুস্তক ও বিভিন্ন পঙ্‌ক্তির প্রতি ফাতহি সাহেবের ভালবাসা বর্ণনাতীত। মরহুমের প্রতিটি কথা ও কাজে খিলাফতের প্রতি তাঁর ভালবাসা, অনুগত্য ও শ্রদ্ধাবোধ প্রস্ফুটিত হত আর সবাই তা দেখতে পেত। তার বদ্ধমূল বিশ্বাস ছিল যে, খিলাফত আল্লাহ্ তা'লার মহান এক নেয়ামত আর তা লাভের কারণে প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার গান গাইতেন। আল্লাহ্‌র এই রজ্জুকে তিনি দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে রেখেছিলেন এবং খিলাফতের আনুগত্যে বিলীন ছিলেন। এটি আমি নিজেও দেখেছি যে, সাক্ষাতের সময় তার চোখ এবং প্রতিটি আচরণে এমন আন্তরিকতা ও ভালবাসার ছাপ দৃষ্টিগোচর হত ও ফুটে উঠত যা ছিল অসাধারণ মানের আর একই সাথে শিষ্টাচার ও শ্রদ্ধাবোধও ছিল অঢেল। তিনি অনেক জ্ঞানগর্ভ বিষয় নিয়ে আসতেন, তার কোন কথা বা দলীল আমি যদি বুঝতে না পারতাম আর গ্রহণ না করতাম অথবা আরো গবেষণার জন্য বলে দিতাম তাহলে তিনি হাস্যবদনে তা মেনে নিতেন। বস্তুত তিনি খিলাফতের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তি এবং বলিষ্ঠ সাহায্যকারী ছিলেন।

উসামা আব্দুল আযীম সাহেব লিখেন, ফাতহি আব্দুস সালাম সাহেব অনেক বড় আলেম ছিলেন। বয়সে বড় হওয়া সত্ত্বেও খুবই বিনয়ী একজন মানুষ ছিলেন। আমাদের মাঝে সবচেয়ে ছোট জনের সাথেও অত্যন্ত নম্র আচরণ করতেন এবং তার পরামর্শ গ্রহণ করতেন। অনেক বড় মনের অধিকারী ছিলেন, কারো সাথে কোন ভুলত্রুটি হয়ে গেলে সবার সামনেই অত্যন্ত বিনয়ের সাথে তার কাছে ক্ষমা চাইতেন এবং তার মাথায় চুমু দিতেন। ইসলামের প্রতি মরহুমের গভীর ভালবাসা ছিল এবং আহমদী যুবকদেরকে জামা'তের এমন সেবক ও সৈনিক বানাতে চাইতেন যাদের মাঝে জ্ঞানের পাশাপাশি আধ্যাত্মিকতাও থাকবে। গভীর রাত পর্যন্ত আমাদেরকে উপদেশ দিতেন এবং জামা'তের দায়দায়িত্বের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতেন। তিনি খুবই কোমল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। কেউ তাঁর সাথে রূঢ় হলে তিনি রূঢ়ভাবে উত্তর দিতেন না। আমি নিজেও জানি, কিছু কিছু লোক তাকে খুবই কষ্ট দিয়েছে, তাঁর সাথে কঠোর আচরণ করেছে কিন্তু কোন কারণে সাময়িকভাবে তাঁর, অর্থাৎ ফাতহি সাহেবের মুখ থেকে কোন কঠিন শব্দ বের হলেও তিনি ক্ষমা চেয়ে নিতেন আর অনেক সময় আমাকেও লিখে দিতেন যে, আমি এই লোকের সাথে অমুক কথা বলেছি এবং তার কাছে ক্ষমাও চেয়েছি। এতবড় হৃদয় খুব কম মানুষের মাঝেই পাওয়া যায়।

তামীম সাহেব লিখেন, অধিকাংশ সময় তিনি বলতেন, খিলাফত ছাড়া ইসলামের কোন কাজই সঠিকভাবে হতে পারে না। আমাদের যে জিনিসটি প্রয়োজন, তা বিভিন্ন-বিবিধ চিন্তাধারার প্রতি আকৃষ্ট করা নয়, বরং আমাদের খলীফার প্রয়োজন, যিনি বিভিন্ন মতভেদের সমাধান দেন এবং ঐশী দিকনির্দেশনার আলোকে আমাদের পথনির্দেশনা প্রদান করেন। মরহুম সর্বদা এমনসব বিষয় পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলেন যা যুগ-খলীফা মেনে নিতেন না। তিনি বলেন, হুযূর! যখনই তিনি আপনার সাথে সাক্ষাৎ করে বের হতেন এক অদ্ভূত আনন্দে বিভোর থাকতেন আর পরমানন্দ ও ভাবাবেগের সাথে সাক্ষাৎ এবং সেখানে আলোচিত কথোপকথনের উল্লেখ করতেন।

ফিলিস্তিনের এক ভদ্রমহিলা সামা সাহেবা বলেন, আমি স্বপ্নে দেখি, যা বাস্তব মনে হচ্ছিল যে, আমি এবং আমার বোন সাহার বসে আছি। সে আমাকে বলছে, তাকে কেউ বলেছে, এক ফিরিশতা এক বৈঠকে বসা আহমদীদের পরিবেষ্টন করে রেখেছিল আর ফাতহি সাহেব এলে তাকে সে বলে, তুমি সবচেয়ে সুন্দর চামেলী ফুল। একথা শুনে আমি আমার বোনকে বলি, ফাতহি সাহেব কতই না পবিত্র সত্তা!

আরবী ডেস্কের তাহের নাদীম সাহেব লিখেন, অনেক বড় আলেম হওয়া সত্ত্বেও তাঁর বিশেষ গুণ ছিল তিনি মূর্তিমান বিনয় ছিলেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বাণীর প্রতি এমন স্বতঃস্ফূর্ত ভক্তি ও ভালবাসা ছিল যে, জানিনা তিনি বারাহীনে আহমদীয়া কতবার পড়েছেন আর এর নতুন নতুন অর্থ বের করে উপস্থাপন করতেন। এবিষয়ে তিনি কয়েকটি প্রোগ্রামও রেকর্ড করিয়েছেন। আমরা সবাই জানি, তিনি জলসারও শোভা ছিলেন। অত্যন্ত বলিষ্ঠকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন আর শেষ দিন তিনি উদ্দীপ্ত নারা ধ্বনিত করতেন, তার নারা বা স্লোগানে এক ধরনের উচ্ছ্বাস-উদ্দীপনা থাকত আর মনে হত যেন হৃদয়ের গভীর থেকে এ আওয়াজ উৎসারিত হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সন্তানসন্ততিকেও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণে পথ চলার সৌভাগ্য দিন এবং সন্তানদের জন্য তাঁর দোয়াসমূহ কবুল করুন আর তাঁর মর্যাদা উন্নীত করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ শ্রদ্ধেয়া রাযিয়া বেগম সাহেবার। তিনি কানাডার সাবেক মুবাল্লেগ ইনচার্জ এবং সিয়েরালিওনের সাবেক আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ খলীল মুবাশ্বের আহমদ সাহেবের সহধর্মিণী ছিলেন। তিনিও বিগত কিছুদিন পূর্বে মৃত্যুবরণ করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ খলীল সাহেব লিখেন, আমার সহধর্মিণী রাযিয়া বেগম সাহেবা তবলীগের ময়দানের সুদীর্ঘ যুগে নিজের ওয়াকফ স্বামীর সাথে সমানতালে ধৈর্য, উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে জামা'তের সেবা করার সুযোগ লাভ করেছেন। বিশেষ করে

আফ্রিকায় আতিথেয়তা ও সেবা করার প্রচুর সুযোগ পেয়েছেন। কখনও কোন অযৌক্তিক দাবি করেন নি এবং সর্বদা ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার সাথে ওয়াকফে যিন্দেগী স্বামীর সাথে একযোগে ধর্মসেবার সুযোগ পেয়েছেন। মরহুমা নিয়মিত ইবাদত-বন্দেগী করতেন এবং সদকা-খয়রাত ও আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রে আন্তরিক উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে অংশগ্রহণ করতেন। মৃত্যুর পূর্বেই সকল খাতের চাঁদা পরিশোধ করেন। মরহুমা ওসীয়্যত করেছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে তিনি এক পুত্র এবং তিন কন্যা আর তাদের সন্তানসন্ততি রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার সাথে ক্ষমা ও অনুগ্রহের আচরণ করুন এবং মর্যাদা উন্নীত করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হল ডা. সুলতান মুবাশ্বের সাহেবের স্ত্রী শ্রদ্ধেয়া সায়েরা সুলতান সাহেবার। হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ার কারণে সম্প্রতি তারও মৃত্যু হয়, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ তিনিও লাজনা ইমাইল্লাহ্, পাকিস্তানের বিভিন্ন বিভাগে কাজ করার সৌভাগ্য পেয়েছেন। 'খিদমতে খালক বা সৃষ্টিসেবা' বিভাগে বিশেষভাবে সেবা করার সৌভাগ্যলাভ করেছেন। তার স্বামী ডা. সুলতান মুবাশ্বের সাহেব লিখেন, তিনি জামা'ত ও খিলাফতের প্রতি পরম বিশ্বস্ত ছিলেন। তিনি এ কারণে খুবই আনন্দিত ছিলেন যে, আমাদের ঘর মসজিদে মুবারকের নিকটে। তার বিয়ের পূর্বেই তার শাশুড়ি পরলোকগত ছিলেন, কিন্তু তার শ্বশুর মওলানা দোস্ত মুহাম্মদ শাহেদ সাহেব জীবিত ছিলেন। এক মেয়ের মত তিনি তার সেবা করেন এবং তার সকল চাহিদার প্রতি যত্নবান ছিলেন। দিবসের যেকোন অংশে তার নিকট পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আগমনকারী অতিথিদের তিনি সুন্দরভাবে আতিথেয়তা করতেন। এক ওয়াকফে যিন্দেগীর পুত্রবধূ হওয়ার দায়িত্ব তিনি যথাযথভাবে পালন করেছেন। দরিদ্রদের প্রতি খুবই সদয় ছিলেন আর এক্ষেত্রে তিনি অনেক বেশি উদারহস্ত ছিলেন। এজন্য কখনও কখনও ঋণগ্রস্তও হয়ে পড়তেন। কয়েকবার নিজের গহনা বিক্রি করে দিয়েছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও সর্বদা দরিদ্রের সাহায্য করেছেন। নিয়মিত চাঁদা পরিশোধ করতেন আর ওসীয়্যত করেছিলেন। গহনা বিক্রি করেও তিনি তার কোন কোন চাঁদা পরিশোধ করেছেন। বিভিন্ন তাহরীকের অধীনে নিজের অলঙ্কারাদি দান করেছেন। শুধু নিজেরই নয় বরং তার মরহুম পিতামাতার পক্ষ থেকেও অবশ্যই চাঁদা দিতেন। তিনি অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, দোয়ায় অভ্যস্ত, রীতিমত নামায ও রোযা পালনকারী এবং তাহাজ্জুদ আদায়কারী নারী ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমাও অনুগ্রহের আচরণ করুন এবং তার মর্যাদা উন্নীত করুন। তার ২টি পুত্র-সন্তান রয়েছে, তাদেরকেও মরহুমার পুণ্য ধরে রাখার তৌফিক দিন আর সন্তানদের এবং ডাক্তার সাহেবকেও ধৈর্য ও মনোবল দান করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ সিরিয়ার শ্রদ্ধেয়া গুসুনুল মাযওয়ানী সাহেবার, যিনি তুরস্কের অধিবাসিনী ছিলেন। তিনিও সম্প্রতি ৩৯ বছর বয়সে ইহধাম ত্যাগ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ মরহুমা দীর্ঘদিন যাবৎ অসুস্থ ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি ওসীয়্যত করেছিলেন। তুরস্ক জামা'তের প্রেসিডেন্ট এবং মুরব্বী সিলসিলা জনাব সাদেক বাট সাহেব লিখেন, ২০১৫ সালে তিনি সিরিয়া থেকে হিজরত করে তুরস্কে আসেন। ২০১৬ সালে তিনি ইসকান্দারুনের লাজনার প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন আর শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লাজনার প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। দীর্ঘদিন যাবৎ অসুস্থ এবং শয্যাশায়ী ছিলেন। কিন্তু অসুস্থতা সত্ত্বেও সবসময় তিনি ধর্মের কাজে লেগে থাকতেন। ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন ফোরামে তবলীগ করতেন। একই সাথে সিরিয়ান আহমদী মহিলাদের তালীম ও তরবিয়তের ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সবারই প্রিয়মানুষ ছিলেন, সত্যিকার সহানুভূতিশীলা ও সবার শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। অনেক মহিলাই আমাকে লিখেছেন আর তারা তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার সাথে ক্ষমা ও অনুগ্রহের আচরণ করুন এবং তার মর্যাদা উন্নীত করুন। যেমনটি আমি বলেছি, নামাযের পর আমি তাদের সবার গায়েবানা জানাযা পড়াব।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)

Dr. Nazifa's Smile Aid
your complete dental healthcare

Oral & Dental Surgery
Dental Fillings
Root Canal Treatment
Dental Crowns, Bridges
Teeth Whitening
Dental Implant
Orthodontics (Braces)
In-House Dental X-RAY

Dr. Nazifa Tasnim
Chief Consultant
Oral & Dental Surgeon
BMDC Reg. NO :: 4299
BDS (DU), PGT (BSMMU)
Specially Trained in Fixed Orthodontic Braces

Smile Aid
444, Kuwaiti Mosque Road
(Apollo Hospital-DhaliBari Link Road)
Shahid Muktijoddha Din Mohammad Dilu Bhaban
Adjacent to Basundhara R/A, Block A (Dhali Bari Pocket Gate)
Vatara, Dhaka - 1212

Consultation Days :: Tuesday - Friday
For Appointment :: 01703 720 606
https://goo.gl/maps/UjX3RdaVzJ22
fb.me/DrSmileAid

Consultation Days :: Saturday - Monday
For Appointment :: 01996 244 087
01778 642 471

Consultant
Holy-Lab Hospital & Diagnostic Center
KumarShil Mor, Brahmanbaria

২৩ জুলাই, ২০২১ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডে অবস্থিত মুবারক মসজিদে প্রদত্ত

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর জুমুআর খুতবা

বিষয়:

হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর স্মৃতিচারণ

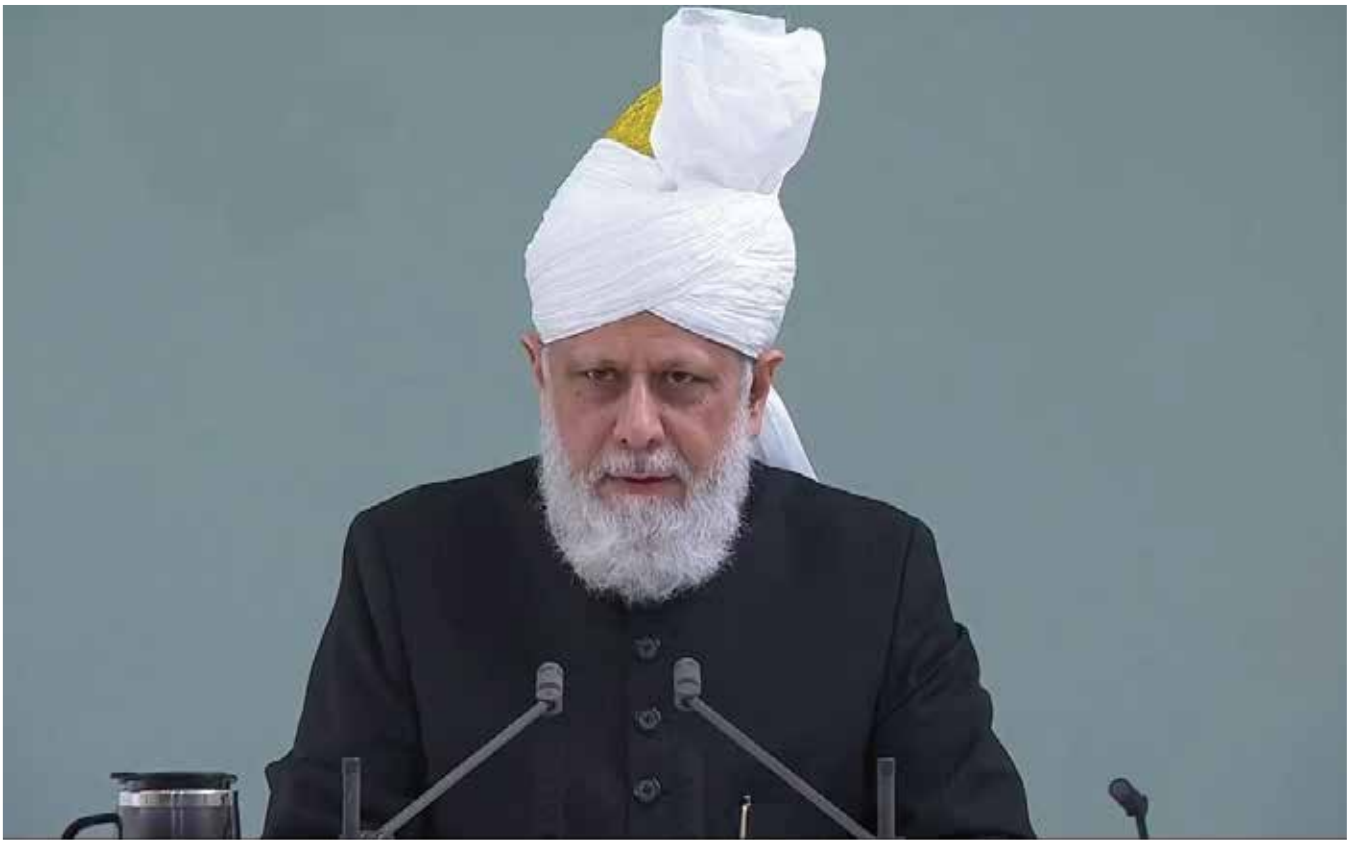

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

বর্তমানে আমরা হযরত উমর (রা.)'র স্মৃতিচারণ করছি। তাঁর যুগে সংঘটিত বিভিন্ন যুদ্ধের কথা হচ্ছিল। আজও সে বরাতেই বর্ণনা অব্যাহত থাকবে। একটি যুদ্ধের নাম হল 'বুয়ায়েব' এর যুদ্ধ যা ১৩ হিজরী সনে আর কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে ১৬ হিজরী সনে সংঘটিত হয়েছে। গত খুতবায় উল্লেখ করা হয়েছে, জিসর বা জিসরের যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের পর হযরত মুসান্না (রা.) হযরত উমর (রা.)-কে যুদ্ধ সম্পর্কে অবগত করেন। হযরত উমর (রা.) দূতকে বলেন, তুমি তোমার সঙ্গীদের নিকট ফিরে যাও আর তাদেরকে বল, ইসলামী বাহিনী যেখানে রয়েছে সেখানেই যেন অবস্থান করে, শীঘ্রই সাহায্য পৌঁছে যাবে। জিসরের যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে হযরত উমর (রা.) ভীষণ কষ্ট পান। তিনি (রা.) গোটা আরবে বক্তা প্রেরণ করেন যারা তেজোদীপ্ত বক্তৃতার মাধ্যমে সমগ্র আরবকে উদ্দীপ্ত করে তোলে। আরবের বিভিন্ন গোত্র জাতিগত এই যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য দলে দলে আসতে আরম্ভ করে। তাদের মাঝে খ্রিস্টানদের বিভিন্ন গোত্রও ছিল। শুধু মুসলমানরাই ছিল না বরং খ্রিস্টানদের কিছু গোত্রও ছিল। হযরত উমর (রা.) মুসলমানদের একটি সেনাদল ইরাক অভিমুখে প্রেরণ করেন আর হযরত মুসান্না (রা.)ও ইরাকের সীমান্তবর্তী অঞ্চল থেকে

সেনা ঐক্যবদ্ধ করেন। রুস্তম এ সংবাদ পাওয়ার পর মেহরানের নেতৃত্বে একটি সেনাবাহিনী মুসলমানদের মোকাবিলার জন্য প্রেরণ করে। কূফার তিন মাইল অদূরে হীরা নামক শহরের পাশে বুয়ায়েব অবস্থিত। বুয়ায়েব হল কূফার নিকটবর্তী একটি নদী যা ফুরাতের শাখা নদী। উভয় পক্ষই এই স্থানে সারিবদ্ধভাবে অবস্থান গ্রহণ করে। এ যুদ্ধটি রমযান মাসে সংঘটিত হয়েছিল। এর নিকটেই পরবর্তীতে কূফা শহর গড়ে উঠেছিল। ইরানি সেনাপতি মেহরান (যুদ্ধ শুরুর পূর্বে) জানতে চায়, আমরা নদী পার হয়ে আসব নাকি তোমরা আসবে? হযরত মুসান্না (রা.) বলেন, তোমরা আস। পূর্বের যুদ্ধে মুসলমানরা নদী অতিক্রম করে গিয়েছিল কিন্তু এবার তিনি সমরকৌশলের অংশ হিসেবে তাদের বলেন যে, তোমরা আস। হযরত মুসান্না (রা.) নিজ সেনাবাহিনীকে সুসংগঠিত করেন এবং তাদেরকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করান, আর এরপর এদের ভিন্ন ভিন্ন অংশের জন্য পৃথক পৃথক অভিজ্ঞ নেতা নিযুক্ত করেন। এরপর সামুস নামের নিজের বিখ্যাত ঘোড়ায় আরোহণ করে ইসলামী সেনাবাহিনীর সারিগুলো ঘুরে ঘুরে পরিদর্শন করেন এবং প্রতিটি পতাকার পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধসংক্রান্ত দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। প্রাণোদ্দীপক বক্তৃতায় এভাবে তাদের মনোবল দৃঢ় করেন যে, আমি বিশ্বাস করি– তোমাদের কারণে আজ আরবদের যেন দুর্নাম না হয়। খোদার কসম! আমি আজ আমার নিজের জন্য কেবল সেসব জিনিসই পছন্দ করি যা তোমাদের সাধারণ কোন মানুষের জন্য আমার দৃষ্টিতে পছন্দনীয়। অর্থাৎ আমি এবং তোমরা সবাই বরাবর বা সমান। এর ফলে ইসলামের নিবেদিতপ্রাণ সেনারা তাদের প্রিয় নেতার ডাকে সর্বান্তকরণে সাড়া দেয় আর কেনই বা দেবে না? তিনি যে তাঁর প্রতিটি কথা ও কাজে সর্বদাই তাদের সাথে অত্যন্ত ন্যায়নিষ্ঠ আচরণ করতেন এবং সুখ-দুঃখে তাদের সাথে থাকতেন আর তাঁর কোন কথায় অঙ্গুলি নির্দেশের সাধ্য কারও ছিল না। সেনাবাহিনীকে দিকনির্দেশনা দিয়ে হযরত মুসান্না (রা.) বলেন, আমি তিনবার তকবীর দিব, এর মধ্যে তোমরা পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করবে আর চতুর্থ তকবীর শোনামাত্রই শত্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। হযরত মুসান্না (রা.) প্রথমবার নারায়ে তকবীর ধ্বনি ধ্বনিত করতেই ইরানি সেনাবাহিনী চটজলদি আক্রমণ করে বসে, এজন্য মুসলমানরাও (কিছুটা) তড়িঘড়ি করে এবং প্রথম তকবীর দেয়ার পরই বনু ইজল গোত্রের কেউ কেউ নিজেদের সারি ভেঙ্গে মোকাবিলার জন্য অগ্রসর হয়। এভাবে সারিগুলোর মধ্যে ফাঁক সৃষ্টি হয়ে যায়। তখন হযরত মুসান্না (রা.) এক ব্যক্তিকে তাদের নিকট এই বার্তা দিয়ে প্রেরণ করেন যে, সেনাপতি তোমাদের সালাম জানিয়েছেন এবং বলেছেন, মুসলমানদেরকে আজ লাঞ্ছিত করো না, ফলে সেই গোত্র নিজেদের সামলে নেয়। এরপর এক ভয়াবহ যুদ্ধ হয় আর ইরানিরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। বলা হয়ে থাকে, এই যুদ্ধে ইরানিদের মৃতের সংখ্যা ছিল এক লক্ষ। ইরানি সৈন্যবাহিনীর প্রধান মেহরানও এই যুদ্ধে নিহত হয়। এই যুদ্ধকে 'ইয়াওমুল আশার'ও বলা হয়, কেননা এ যুদ্ধে একশ'জন এমন লোক ছিলেন যাদের প্রত্যেকে দশ জন করে সৈন্যকে হত্যা করেছিলেন। ইরানি সৈন্যরা পরাজিত হয়ে নিরাপদ স্থানে পৌঁছার উদ্দেশ্যে পুলের দিকে ছুটে পালাতে থাকে যেন তারা নদী পার হতে পারে, কিন্তু হযরত মুসান্না (রা.) তাঁর অধীনস্থ সৈন্যদলকে সাথে নিয়ে তাদের পিছু ধাওয়া করেন এবং পুল পার হবার পূর্বেই তাদেরকে ঘিরে ফেলেন আর নদীর ওপরের পুল ভেঙে দিয়ে অনেক ইরানি সৈন্যকে হত্যা করেন। পরবর্তীতে হযরত মুসান্না (রা.) দুঃখ করে বলতেন, আমি পরাজিত সৈন্যদের পিছু ধাওয়া করে ভুল করেছি! এমনটি করা আমার উচিত হয় নি। তিনি (রা.) বলতেন, আমি অনেক বড় ভুল করেছি, কেননা যাদের লড়াই করার শক্তি নেই তাদের সাথে লড়াই করাটা আমার জন্য শোভনীয় নয়। ভবিষ্যতে আমি কখনও এমনটি করব না। অতঃপর তিনি (রা.) মুসলমানদের উদ্দেশ্যে নসীহত করে বলেন, হে মুসলমানেরা! তোমরা কখনও এমনটি করবে না এবং এ বিষয়ে আমার অনুকরণ করবে না। পলায়নরত লোকদের পিছু ধাওয়া করার মত ভুল কাজটি আমার দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। এমনটি হওয়া উচিত হয় নি। মূলত এটিই হল ইসলামের নৈতিক শিক্ষা। এই যুদ্ধে মুসলমান বাহিনীর অনেক বড় বড় কীর্তিমান ব্যক্তিত্ব যেমন- খালীদ বিন হেলাল এবং মাসঊদ বিন হারেসাও শহীদ হয়েছিলেন। হযরত মুসান্না (রা.) শহীদদের জানাযা পড়ান এবং বলেন, খোদার কসম! কেবল এ বিষয়টিই আমার দুঃখ-কষ্ট লাঘবের কারণ হয় যে, এসব লোক এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, পরম সাহসিকতা ও বীরত্ব প্রদর্শন করেছেন এবং অটল ও অবিচল থাকেন আর তারা কোন প্রকার বিচলিত হয় নি এবং দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত হন নি। এছাড়া এ বিষয়টিও আমার দুঃখকে হালকা করে যে, শাহাদত পাপমোচনের জন্য প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ হয়ে থাকে। এই যুদ্ধের স্মৃতিচারণে ঐতিহাসিকরা একটি ঘটনার উল্লেখ করে থাকেন যার মাধ্যমে মুসলমান নারীদের সাহসিকতা ও বীরত্বের ওপর আলোকপাত হয়। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কাওয়াদেস নামক দূরবর্তী একটি স্থানে মুসলমান সেনাদলের নারী ও শিশুদের ক্যাম্প বা শিবির ছিল। যুদ্ধ শেষে মুসলমানদের একটি সৈন্যদল ঘোড়া হাঁকিয়ে ক্যাম্পের সামনে পৌঁছলে মুসলমান নারীরা ভুলবশত মনে করে, এটি হয়তো সৈন্যবাহিনী যারা আমাদের ওপর আক্রমণ করতে এসেছে। তখন তারা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে শিশুদের বেষ্টনিতে নিয়ে নেন এবং পাথর ও লাঠিসোটা নিয়ে মরতে-মারতে প্রস্তুত হয়ে যান। সেনাদলটি নিকটে পৌঁছার পর তারা

বুঝতে পারেন, এরা তো মুসলিম বাহিনী। (এ অবস্থা দেখে) এই দলের নেতা আমর বিন আব্দুল মসীহ্ অবলীলায় বলে উঠেন, আল্লাহ্‌র বাহিনীর নারীদের এটিই শোভা পায়। বুয়ায়েব এর যুদ্ধ শেষ হয় ঠিকই কিন্তু এর রেখে যাওয়া প্রভাব ছিল সুগভীর। ইরানের ইসলামী অভিযানে এর পূর্বে কখনও-ই এত প্রাণহানি ঘটে নি। এ যুদ্ধের অন্য যে প্রভাব পড়ে তা হল, ইরাকের অধিকাংশ স্থানে মুসলমানদের অবস্থান সুদৃঢ় হয় এবং ইরাকের সীমান্তবর্তী অঞ্চল দজলা পর্যন্ত তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। এছাড়া সামান্য যুদ্ধের পরই আশপাশের সেসব এলাকার ওপরও নতুনভাবে মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয় যা (তারা) পূর্বে ছেড়ে এসেছিল। পক্ষান্তরে ইরানি সেনাবাহিনী পিছু হঠে গিয়ে দজলার ওপারে চলে যাওয়াতেই মঙ্গল নিহিত বলে মনে করে। এই বিজয়ের পর মুসলমানরা ইরাকের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে।

এরপর ১৪ হিজরী সনে কাদসিয়ার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কাদসিয়া বর্তমান ইরাকের একটি স্থান যা কূফা থেকে ৪৫ মাইল দূরত্বে অবস্থিত। ১৪ হিজরী সনে হযরত উমর ফারুক (রা.)'র খিলাফতকালে মুসলমান এবং ইরানিদের মাঝে কাদসিয়া নামক স্থানে একটি চূড়ান্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয় যার ফলে ইরানি সাম্রাজ্য মুসলমানদের করায়ত্তে চলে আসে। পারস্যবাসী যখন মুসলমানদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবগত হয় তখন তারা তাদের দুই নেতা রুস্তম এবং ফেরোজানকে বলে, তোমরা উভয়ে বিতণ্ডায় লিপ্ত রয়েছ আর এভাবে তোমরা দুজনই পারস্যবাসীকে দুর্বল করে শত্রুদের মনোবল বাড়িয়ে দিয়েছ। এখন পরিস্থিতি এতদূর গড়িয়েছে যে, আমরা যদি এভাবেই চলতে থাকি তাহলে ইরান ধ্বংস হয়ে যাবে, কেননা বাগদাদ, মিদিয়ানের নিকটবর্তী অঞ্চল সাবাত এবং বাগদাদ ও মসূল এর মধ্যবর্তী অঞ্চল তিকরিত যা বাগদাদ থেকে ৩০ ফারসাখ, অর্থাৎ ৯০ মাইল দূরত্বে অবস্থিত একটি বিখ্যাত শহর। এরপর এখন কেবল মিদিয়ান শহরই বাকি রয়ে গেছে। তারা বলে, তোমরা উভয়ে ঐক্যমত না হলে প্রথমে আমরা তোমাদের দুজনকে হত্যা করব, এরপর নিজেরা ধ্বংস হয়েই ক্ষান্ত হব, অর্থাৎ এরপর আমরা নিজেরাই যুদ্ধ করব। রুস্তম এবং ফেরোজান বোরানকে পদচ্যুত করে ইয়াযদাজারদকে সিংহাসনে বসিয়ে দেয়, তখন তার বয়স ছিল ২১ বছর। এরপর সমস্ত দুর্গ এবং সেনা ছাউনিগুলোকে মজবুত করে দেয়া হয়। হযরত মুসান্না (রা.) যখন পারস্যবাসীদের এসব কর্মকাণ্ড সম্পর্কে হযরত উমর (রা.)-কে অবহিত করেন তখন হযরত উমর (রা.) বলেন, খোদার কসম! অনারব বাদশাহ্‌দের মোকাবিলা আমি আরব নেতৃবৃন্দ ও বাদশাহ্‌দের মাধ্যমেই করাব। অতএব সকল নেতা, বিজ্ঞ-প্রাজ্ঞ, সম্মানিত বক্তা ও কবিকে মোকাবিলার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়। সেই সাথে হযরত মুসান্না (রা.)-কে এই নির্দেশ দেন যে, অনারব অঞ্চল থেকে বের হয়ে তোমরা সেসব উপকূলীয় অঞ্চলে চলে আস যা তোমাদের এবং তাদের সীমান্তের নিকটবর্তী। রবীয়া এবং মুজার গোত্রের লোকদেরকেও (তিনি) সাথে নেয়ার আদেশ দেন। হযরত উমর (রা.) আরবের চতুর্দিকে নেতা প্রেরণ করে গোত্রপতি ও নেতৃবৃন্দকে মক্কায় একত্র হওয়ার নির্দেশ দেন। হজ্জ নিকটবর্তী হওয়ায় হযরত উমর (রা.) হজ্জের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। হজ্জের সময় আরব গোত্রগুলো সবদিক থেকে জড়ো হয়। তিনি যখন হজ্জ থেকে ফিরে আসেন তখন মদীনায় অনেক বড় এক সেনাদল সমবেত ছিল। হযরত উমর (রা.) নিজে সেই সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দেন আর হযরত আলী (রা.)-কে মদীনায় নেতা নিযুক্ত করে তিনি (যুদ্ধের উদ্দেশ্যে) যাত্রা করেন এবং সিরারে গিয়ে ঘাঁটি স্থাপন করেন। সিরারও মদীনা থেকে তিন মাইলের দূরত্বে অবস্থিত একটি ঝর্ণা। তিনি বলেন, তখনও হযরত উমর (রা.)'র যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার ব্যাপারে চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত হয় নি। সেনাদল নিয়ে যাত্রা করলেও তখনও এ সিদ্ধান্ত হয় নি যে, তিনি নিজেই যাবেন নাকি কিছুদূর গিয়ে অন্য কাউকে সেনাপতি বানিয়ে প্রেরণ করবেন। যাহোক, তাবারীর ইতিহাসগ্রন্থে (উল্লেখ) রয়েছে, হযরত উমর (রা.) লোকদের সাথে পরামর্শ করেন, সবাই তাঁকে ইরান যাওয়ার পরামর্শ দেয়। তারা বলে, পুরো সেনাবাহিনীকে আপনার নেতৃত্বেই নিয়ে যান। সিরার পৌঁছার পূর্বে হযরত উমর (রা.) কারও সাথে পরামর্শ করেন নি। কিন্তু হযরত আব্দুর রহমান (রা.) তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা তাকে সেখানে যেতে বাধা দেয়। অন্যেরা বলে, আপনি সেনাবাহিনী নিয়ে অবশ্যই যান, কিন্তু হযরত আব্দুর রহমান (রা.) বলেন, না! ইতোপূর্বে আমি মহানবী (সা.) ছাড়া আর কারও জন্যই আমার পিতামাতাকে উৎসর্গ করি নি এবং তাঁর পরেও (আর কারও জন্য) এমনটি করব না, কিন্তু আজ আমি বলছি, হে সেই ব্যক্তি যাঁর জন্য আমার পিতামাতা উৎসর্গিত! এই বিষয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আপনি আমার হাতে ছেড়ে দিন। (একথা) তিনি হযরত উমর (রা.)-কে বলেন। এরপর তিনি হযরত উমর (রা.)-কে পরামর্শ দিয়ে বলেন, আপনি সিরারেই অবস্থান করুন এবং এখান থেকে একটি বিশাল সেনাবাহিনী পাঠিয়ে দিন। পুনরায় তিনি হযরত উমর (রা.)-কে বলেন, প্রথম থেকে আপনি দেখেছেন যে, আপনার সেনাবাহিনী সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লার সিদ্ধান্ত কী ছিল? আপনার বাহিনী যদি পরাজিত হয় তাহলে তা আপনার পরাজয়ের সমতুল্য হবে না। কিন্তু যদি আপনি প্রথমেই শহীদ হয়ে যান বা পরাজয়বরণ করেন তাহলে আমার আশঙ্কা হল, মুসলমানরা এরপর আর কখনও-ই তাকবীর দিতে পারবে না কিংবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র সাক্ষ্যও দিতে পারবে না। বিশিষ্ট এবং বিজ্ঞ সাহাবীদের সাথে পরমর্শ করার পর হযরত উমর (রা.) একটি সাধারণ সভা করেন। হযরত আব্দুর রহমান (রা)'র এ পরামর্শ পাওয়ার পর

তিনি (রা.) বিশিষ্ট সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেন এবং এরপর একটি সাধারণ সভার আয়োজন করেন, যেখানে বক্তৃতায় হযরত উমর (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে ইসলাম ধর্মে সমেবত করেছেন আর তাদের হৃদয়ে পরস্পরের প্রতি হৃদ্যতা সৃষ্টি করেছেন এবং ইসলাম ধর্মে সবাইকে ভাই-ভাই বানিয়ে দিয়েছেন। আর মুসলমানদের পারস্পরিক অবস্থা হল, এক দেহের ন্যায়। এর এক অংশের কষ্ট হলে অন্য অংশও সেটি অনুভব না করে থাকতে পারে না। অতএব, মুসলমানদের জন্য আবশ্যক হল, তাদের বিষয়াদি পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত, বিশেষত তাদের মধ্য থেকে জ্ঞানীদের পরামর্শ যেন গ্রহণ করা হয়। আর মানুষের জন্য আবশ্যক হল, যে বিষয়ে সবাই একমত ও সন্তুষ্ট হয় তার অনুসরণ ও অনুগত্য করা। আমীরের জন্য আবশ্যক হল, তিনি যেন মানুষের মধ্য থেকে বিজ্ঞ-প্রাজ্ঞদের পরামর্শকে স্বীকৃতি দেন, অর্থাৎ জনগণ সম্পর্কে তাদের অভিমত এবং যুদ্ধ সম্পর্কে তাদের পরিকল্পনাকে (যেন স্বীকৃতি দেন)। হযরত উমর (রা.) বলেন, হে লোকসকল! আমি এক সেনা হিসেবে তোমাদের সাথে যেতে চেয়েছিলাম ও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তোমাদের পরামর্শদাতারা আমাকে তা থেকে বিরত রেখেছে। তাই এখন আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমি আর যাব না, বরং অন্য কাউকে প্রেরণ করব। তখন হযরত উমর (রা.) কারও সন্ধানে ছিলেন। এরই মধ্যে তাঁর কাছে হযরত সা'দ (রা.)'র পত্র আসে। হযরত সা'দ (রা.) তখন নাজদ্-এর সদকা ইত্যাদি সংগ্রহের জন্য (কর্মকর্তা হিসেবে) দায়িত্ব পালন করছিলেন। হযরত উমর (রা.) বলেন, আমাকে কারও নাম বল যাকে সেনাপতি নিযুক্ত করা যায়। হযরত আব্দুর রহমান (রা.) বলেন, সেই ব্যক্তি তো আপনি পেয়েই গেছেন। হযরত উমর (রা.) জিজ্ঞেস করেন, সে কে? হযরত আব্দুর রহমান (রা.) বলেন, বেলাভূমির বাঘ সা'দ বিন মালেক, অর্থাৎ সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.)। অন্যরাও এই পরামর্শের সমর্থন করে।

তাবারীর ইতিহাসে (উল্লেখ) রয়েছে, হযরত উমর (রা.) হযরত সা'দ (রা.)-কে আমীর নিযুক্ত করে নসীহত করেন, হে সা'দ! তুমি এটি ভেবো না যে, তোমাকে মহানবী (সা.)-এর মামা এবং সাহাবী বলা হয়। আল্লাহ্ তা'লা মন্দকে মন্দ দ্বারা প্রতিহত করেন না, বরং মন্দকে পুণ্য দ্বারা প্রতিহত করেন। আল্লাহ্ তা'লা এবং বান্দার মাঝে অনুগত্য ছাড়া আর কোন সম্পর্ক নেই। তিনি এই নসীহত করেন। যাত্রাকালে হযরত উমর (রা.) হযরত সা'দ (রা.)-কে বলেন, আমার নসীহতকে স্মরণ রাখবে। তুমি এক কঠিন এবং গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করেছ, অতএব নিজ সত্তা এবং নিজ সাথীদের মাঝে পুণ্যের অভ্যাস সৃষ্টি কর এবং এর মাধ্যমে বিজয় যাচনা কর। আর স্মরণ রেখ! সকল অভ্যাস সৃষ্টির জন্যই একটি মাধ্যম থাকে। আর পুণ্যের অভ্যাস সৃষ্টির মাধ্যম হল, ধৈর্য। ধৈর্যধারণ করলে পুণ্যের অভ্যাস সৃষ্টি হবে। অতএব, তোমাদের ওপর আপতিত সকল বিপদ এবং কষ্টে ধৈর্যধারণ করবে। এর মাধ্যমে তোমাদের আল্লাহ্ তা'লার ভীতি অর্জিত হবে।

অতঃপর তিনি (রা.) বলেন, নিজ সঙ্গী মুসলমানদের নিয়ে শারাফ থেকে ইরান অভিমুখে অগ্রসর হও। শারাফ হল, নাজাদে একটি ঝর্ণা। তিনি বলেন, সেখানে সেনাবাহিনী একত্র হয়েছে, সেখান থেকে (অগ্রযাত্রা) আরম্ভ কর। আল্লাহ্ তা'লার ওপর ভরসা কর আর নিজের সমস্ত বিষয়ে তাঁর কাছেই সাহায্য চাও এবং স্মরণ রেখ, তুমি সেই জাতির মোকাবিলার জন্য যাচ্ছ যাদের সংখ্যা অনেক বেশি, সাজসরঞ্জাম অনেক বেশি, যুদ্ধশক্তি একান্ত সুদৃঢ়। আর এমন অঞ্চলের মোকাবিলার জন্য যাচ্ছ যা লড়াইয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে কঠিন এবং সুরক্ষিত, যদিও উর্বরতা এবং সতেজতার কারণে উত্তম এলাকা। আর লক্ষ্য রেখ! তাদের প্রতারণার শিকার হয়ো না যেন, কেননা তারা চতুর এবং প্রতারক লোক। আর তুমি যখন কাদসিয়া পৌঁছবে তখন তোমরা পাহাড়ী অঞ্চলের শেষপ্রান্ত এবং সমতল ভূমির প্রারম্ভিক প্রান্তে থাকবে। অতএব, তোমরা সে স্থলেই অবস্থান করবে এবং সেখান থেকে সরবে না। অর্থাৎ জায়গাও বলে দেন যে, সেখানেই থাকবে। শত্রুরা যখন তোমাদের আগমন সংবাদ পাবে তখন তারা ক্রোধান্বিত হয়ে নিজেদের সকল পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে পূর্ণ শক্তিতে তোমাদের ওপর আক্রমণ করবে। এমতাবস্থায় তোমরা যদি শত্রুদের সামনে পূর্ণ অবিচলতার সাথে দণ্ডায়মান থাক এবং শত্রুর সাথে লড়াইয়ে তোমাদের পুণ্যের আকাঙ্ক্ষা থাকে আর তোমাদের সংকল্প সঠিক থাকে তাহলে আমি আশা করি, তোমরা তাদের ওপর বিজয়লাভ করবে।

আর এরপর তারা কখনও এভাবে একত্র হয়ে তোমাদের মোকাবিলা করতে পারবে না; আর যদি করেও তবে তাদের মন সায় দিবে না অর্থাৎ ভীতিপূর্ণ হৃদয়ে তারা মোকাবিলা বা যুদ্ধ করবে। আর যদি ভিন্ন কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, অর্থাৎ যদি পিছু হঠার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় বা পরাজয়মূলক পরিস্থিতি দেখা দেয়; তাহলে তোমরা ইরানি অঞ্চলের নিকটবর্তী যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পিছু হটে নিজেদের অঞ্চলের নিকটবর্তী পাহাড়ে চলে আসবে। এর ফলে নিজেদের অঞ্চলে তোমরা অধিক মনোবল পাবে আর সেই অঞ্চল সম্পর্কে তোমরা বেশি অবগত থাকবে। পক্ষান্তরে ইরানিরা তোমাদের অঞ্চলে ভীতসন্ত্রস্ত থাকবে এবং তারা সেই অঞ্চল সম্পর্কে অনবহিত থাকবে, এমনকি খোদা তা'লা পুনরায় তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে জয়লাভের সুযোগ করে দিবেন। তিনি (রা.) নিশ্চিত ছিলেন, বিজয় তো হবেই; সাময়িকভাবে যদি এমন কোন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েও যায়, তবুও চূড়ান্ত বিজয় তোমাদেরই হবে। মোটকথা, এই

বাহিনীর প্রতিটি গতিবিধি হযরত উমর (রা.)'র মদীনা থেকে প্রেরিত বিস্তারিত নির্দেশনা অনুসারে পরিচালিত হচ্ছিল। অতএব, তাবারী লিখেছেন,

শারাফ থেকে সৈন্যবাহিনীর যাত্রার তারিখও হযরত উমর (রা.) নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন এবং এই নির্দেশনাও প্রদান করেছিলেন যে, কাদসিয়া পৌঁছে সৈন্যবাহিনী যেন উযায়বুল হাজানাত ও উযায়বুল কওয়াদেস স্থানদ্বয়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থান নেয় এবং এই স্থানে যেন সৈন্যবাহিনীকে পূর্ব-পশ্চিম বরাবর ছড়িয়ে দেয়া হয়। উযায়েব স্থানটিও কাদসিয়া ও মুগীসা'র মধ্যবর্তী একটি ঘাট, যা কাদসিয়া থেকে চার মাইল ও মুগীসা থেকে বত্রিশ মাইল দূরত্বে অবস্থিত। হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.)'র প্রতি প্রেরিত হযরত উমর (রা.)'র পত্র থেকে জানা যায় যে, সেখানে দুটি উযায়েব ছিল; অর্থাৎ ইতিহাস থেকে এই বিষয়টিও জানা যায়। হযরত উমর (রা.) হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.)-কে চার হাজার মুজাহিদ সঙ্গে দিয়ে ইরান অভিমুখে প্রেরণ করেন। পরবর্তীতে ইয়েমেনের দুই হাজার ও নাজাদের দুই হাজার সৈন্যও তাদের সাথে যুক্ত হয়; পথিমধ্যে বনু আসাদের তিন হাজার লোক ও আশআস বিন কায়েস কিন্দী নিজের অধীনে থাকা এক হাজার সাতশ' ইয়েমেনি সৈন্যসহ যোগ দেন। মুসলমান বাহিনীর সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে বাড়তে, [আগে থেকে বিদ্যমান সৈন্যসহ] ত্রিশ হাজারের ওপরে গিয়ে পৌঁছে। এই বাহিনীর গুরুত্ব এভাবে অনুমান করা যেতে পারে যে, এতে ৯৯জন এমন সাহাবী ছিলেন যারা মহানবী (সা.)-এর সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন; তাবারী তাদের সংখ্যা ৭০-এর অধিক বলে বর্ণনা করেছেন; ৩১০জনের অধিক এমন (যোদ্ধা) ছিলেন যারা ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে আরম্ভ করে বয়আতে রিযওয়ান পর্যন্ত মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সান্নিধ্য লাভের সম্মানলাভ করেছিলেন; ৩০০জন এমন সাহাবী ছিলেন যারা মক্কা-বিজয়ে অংশ নিয়েছিলেন; ৭০০জন এমন ব্যক্তি ছিলেন যারা স্বয়ং সাহাবী না হলেও সাহাবীদের সন্তান হওয়ার গৌরবের অধিকারী ছিলেন। হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.) শারাফ পৌঁছে শিবির স্থাপন করেন। মুসান্না (রা.) আট হাজার সেনা নিয়ে কূফার নিকটবর্তী একটি পানির ঘাট যু-কা'র নামক স্থানে মুসলমানদের সাহায্যকারী বাহিনীর জন্য অপেক্ষা করছিলেন; এই অপেক্ষারত অবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি বশীর বিন খাসাসিয়াকে নিজের স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন। অর্থাৎ মুসান্না (রা.) সেখানে মৃত্যুবরণ করেন। হযরত সা'দ (রা.) শারাফ পৌঁছে হযরত উমর (রা.)-কে সৈন্যবাহিনীর অবস্থানের বিস্তারিত তথ্য প্রেরণ করেন। এর প্রেক্ষিতে হযরত উমর (রা.) স্বয়ং সৈন্যবাহিনীকে সুবিন্যস্ত করেন এবং পত্রে লিখে দেন যে, পুরো বাহিনীকে দশজন দশজন করে মুজাহিদ-দলে বিভক্ত করে প্রতি দলের জন্য একজন করে নেতা নিযুক্ত করে দাও এবং সেই দলগুলোর ওপর একজন বড় কর্মকর্তা নির্ধারণ করে দিও; এরপর তাদের সংখ্যা গণনা করে তাদেরকে কাদসিয়া অভিমুখে প্রেরণ কর। আর মুগীরা বিন শু'বার দলটিকে তোমার নেতৃত্বে রাখবে। অর্থাৎ হযরত উমর (রা.) হযরত সা'দ (রা.)-কে এই নির্দেশনা প্রদান করেন যে, মুগীরা বিন শু'বার দলটিকে তোমার নিজের নেতৃত্বে রাখবে। এর পরবর্তী অবস্থার বিস্তারিত আমাকে লিখে পাঠাবে, আর এরপর প্রতিদিন যে অগ্রগতি হবে বা যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে– তা আমাকে জানাতে থাকবে। হযরত সা'দ (রা.) এসব নির্দেশনা অনুসারে বাহিনীকে বিন্যস্ত করেন এবং হযরত উমর (রা.)-কে বিস্তারিত অবস্থা লিখে জানান। প্রতি দশজনের জন্য তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা মহানবী (সা.)-এর যুগে প্রচলিত ব্যবস্থাপনা অনুযায়ীই ছিল। অপর এক পত্রে হযরত উমর (রা.) হযরত সা'দ (রা.)-কে লিখেন, নিজ হৃদয়কে উপদেশ দিতে থাক এবং নিজের সৈন্যবাহিনীকেও উপদেশ দিতে থাক। ধৈর্যধারণ কর; কেননা সংকল্প অনুযায়ী খোদা তা'লার পক্ষ থেকে প্রতিদান পাওয়া যায়। যে দায়িত্বভার তোমার প্রতি অর্পিত হয়েছে এবং যে দায়িত্ব তুমি পালন করতে যাচ্ছ তাতে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন কর। অনেক বেশি সতর্কতা অবলম্বন কর। খোদার কাছে নিরাপত্তা যাচনা কর এবং অধিকহারে 'লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্' পাঠ কর। আমাকে লিখে পাঠাও যে, তোমার সৈন্যবাহিনী কতদূর পর্যন্ত পৌঁছেছে এবং তোমাদের মোকাবিলায় শত্রুপক্ষের সেনাপতি হিসেবে কাকে নিযুক্ত করা হয়েছে? কেননা কিছু নির্দেশনা, যা আমি লিখতে চাচ্ছিলাম, তা শুধুমাত্র এজন্য লিখতে পারি নি, কারণ তোমাদের ও তোমাদের শত্রুপক্ষের কতিপয় অবস্থা সম্পর্কে আমি পুরোপুরি অবহিত নই। সার্বিক অবস্থা লিখে পাঠাও, এরপর আমি তোমাদেরকে আরো দিকনির্দেশনা প্রদান করব। অতএব, মুসলিম সৈন্যবাহিনীর বিভিন্ন অবস্থানস্থল সম্পর্কে আমাকে বিস্তারিত লিখে পাঠাও এবং সেই এলাকার অবস্থা, যা তোমাদের এবং ইরানিদের রাজধানী মিদিয়ানের মধ্যে অবস্থিত, এমনভাবে লিখে পাঠাও যেন তা আমার চাক্ষুস প্রত্যক্ষ করার ন্যায় চিত্র ফুটে ওঠে। অর্থাৎ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পূর্ণ চিত্র লিখে পাঠাও এবং তোমাদের সার্বিক অবস্থা আমাকে বিস্তারিতভাবে অবগত কর আর খোদা তা'লাকে ভয় কর এবং তাঁর কাছেই প্রত্যাশা রাখ আর নিজ কাজের ক্ষেত্রে তাঁরই প্রতি ভরসা কর এবং এ বিষয়টিকে ভয় করতে থাক যে, খোদা তা'লা তোমাদেরকে বাদ দিয়ে অন্য কোন জাতিকে এই দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য নিয়ে আসতে পারেন। অর্থাৎ সর্বদা তোমাদের উক্ত বিষয়ের ভয় থাকা উচিত। এমন নয় যে, তোমাদের ঠিকাদার বানিয়ে দেয়া হয়েছে। যদি তোমরা এই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হও তবে খোদা তা'লা

তোমাদের পরিবর্তে অন্য কাউকে এই দায়িত্ব পালনের জন্য নিয়ে আসবেন আর এ কাজ অবশ্যই সম্পাদিত হবে। কাদসিয়া পৌঁছে হযরত সা'দ (রা.) হযরত উমর (রা.)-কে তাঁর সেনাবাহিনীর অবস্থান এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত লিখে পাঠান। হযরত উমর (রা.) প্রত্যুত্তরে লিখেন, নিজ জায়গায় অবস্থান কর যতক্ষণ না শত্রুপক্ষ আক্রমণের সূচনা করে। শত্রুপক্ষ যদি পরাজয়বরণ করে সেক্ষেত্রে মিদিয়ান পর্যন্ত অগ্রাভিযান পরিচালনা করবে।

হযরত সা'দ (রা.)'র বরাতে এ বিষয়ে (পূর্বেও) বর্ণিত হয়েছে; কিন্তু এখানে হযরত উমর (রা.)'র প্রেক্ষিতেও বর্ণনা করা প্রয়োজন যে, হযরত সা'দ (রা.) খিলাফতের নির্দেশনানুযায়ী কাদসিয়ায় এক মাস অবস্থান করেন; তথাপি ইরানিদের মধ্য হতে কেউ তাদের মোকাবিলা করার জন্য আসে নি। এতে উক্ত এলাকার লোকেরা ইরানের বাদশাহ্ ইয়াযদাজারদ-এর কাছে পত্র লিখে যে, আরবরা কিছুদিন যাবৎ কাদসিয়াতে অবস্থান করছে আর আপনারা তাদের মোকাবিলার জন্য কোন পদক্ষেপই গ্রহণ করেন নি। তারা ফুরাত পর্যন্ত এলাকা ধ্বংস করে দিয়েছে এবং গবাদিপশু ইত্যাদি লুটপাট করেছে। যদি সাহায্য না আসে তাহলে আমরা সবকিছু তাদের হাতে তুলে দিব। এই পত্র আসার পর ইয়াযদাজারদ রুস্তমকে ডেকে পাঠায় আর সে বিভিন্ন অজুহাতে যুদ্ধ এড়ানোর চেষ্টা করতে থাকে। আর তার স্থলে জালিনুসকে সেনাপতি নিযুক্ত করার পরামর্শ দেয়। কিন্তু বাদশাহ্‌র সামনে তার কোন অজুহাতই ধোপে টিকে নি এবং সৈন্যবাহিনী সাথে নিয়ে তাকে যেতে হয়।

হযরত উমর (রা.) হযরত সা'দ (রা.)-কে লিখেন, রুস্তমকে ইসলামের দাওয়াত প্রদানের উদ্দেশ্যে তুমি এমন লোকদের প্রেরণ কর যারা সম্মানিত, বুদ্ধিমান এবং সাহসী। অর্থাৎ বিনাকারণে যুদ্ধ শুরু করলেই হবে না, বরং শত্রুপক্ষকেও ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাতে হবে। তিনি (রা.) বলেন, এই তবলীগকে আল্লাহ্ তা'লা তাদের লাঞ্ছনা এবং আমাদের জন্য সফলতার কারণ করবেন। তুমি প্রত্যহ আমাকে পত্র লিখতে থাকবে। এরপর হযরত সা'দ (রা.) ১৪জন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে নির্বাচিত করে ইরানের বাদশাহ্'র দরবারে প্রতিনিধি বা দূত হিসেবে প্রেরণ করেন যেন তারা ইরানের বাদশাহ্ ইয়াযদাজারদকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাতে পারে। মুসলমানরা অশ্বারোহী ছিল। সেই মুসলমানদের ওপর চাদর ছিল এবং তাদের হাতে ছিল চাবুক। সর্বপ্রথম হযরত নো'মান বিন মুকাররিন বাদশাহ্'র সাথে কথা বলেন, অতঃপর মুগীরা বিন যারারা কথা বলেন।

মুগীরা বাদশাহ্‌কে উদ্দেশ্য করে বলেন, তোমাদের সাথে হয় যুদ্ধ হবে নতুবা তোমাদেরকে কর প্রদান করতে হবে। এখন সিদ্ধান্ত তোমাদের হাতে– আমাদের বশ্যতা স্বীকার করে কর প্রদান করবে, না হয় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। অবশ্য তৃতীয় আরেকটি পথ আছে, যদি তোমরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নাও তাহলে এসব কিছু থেকে তোমরা নিজেদের নিরাপদ করবে। তখন ইয়াযদাজারদ বলে, যদি দূতকে হত্যা করা নিষিদ্ধ না হত তাহলে আমি তোমাদের সবাইকে হত্যা করতাম। আমার কাছ থেকে তোমরা কিছুই পাবে না। এখান থেকে ভাগো। এরপর সে মাটির একটি ঝুড়ি আনিয়ে বলে, আমার পক্ষ থেকে এটি নিয়ে যাও আর সে আদেশ দিয়ে বলল, এই দূতদেরকে শহরের দ্বার দিয়ে বের করে দাও। আসেম বিন আমর সেই মাটি গ্রহণ করেন এবং হযরত সা'দ (রা.)-কে সেটি দিয়ে বলেন, সুখবর! আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এ দেশের চাবি প্রদান করেছেন। এ ঘটনার পর কয়েক মাস পর্যন্ত উভয়পক্ষে নীরবতা বিরাজ করে। রুস্তম তার সেনাদল নিয়ে সাবাতে পড়ে থাকে। ইয়াযদাজারদ এর বারবার বলা সত্ত্বেও যুদ্ধ এড়িয়ে যেতে থাকে। লোকেরা ইয়াযদাজারদকে বলে যে, আমাদের সুরক্ষা করুন অন্যথায় আমরা আরববাসীদের অনুসারী হয়ে যাব। তখন বাধ্য হয়ে রুস্তমকে আক্রমণের জন্য অগ্রসর হতে হয় আর ইরানি সেনাবাহিনী সাবাত থেকে বেরিয়ে কাদসিয়ার প্রান্তরে তাঁবু খাটায়। রুস্তম যখন সাবাত থেকে বের হয় তখন তার সৈন্যসংখ্যা ছিল এক লক্ষ ত্রিশ হাজার এবং তার সাথে ছিল তেত্রিশটি হাতি। রুস্তম মিদিয়ান থেকে যাত্রা করে কাদসিয়া পৌঁছতে চার মাস সময় ব্যয় করে। রুস্তম কাদসিয়াতে শিবির স্থাপন করে পরবর্তী প্রভাতে মুসলিম সৈন্যসংখ্যার খবরাখবর সংগ্রহ করে আর মুসলমানদেরকে ফেরত যেতে বলে এবং সন্ধিচুক্তির প্রস্তাব দেয়। রুস্তম মুসলমানদেরকে বলে, সন্ধি স্থাপন কর এবং ফেরত চলে যাও। এর প্রত্যুত্তরে মুসলমানরা বলেন, আমরা জাগতিকতার আকাঙ্ক্ষায় এখানে আসি নি বরং আমাদের উদ্দেশ্য হল, পরকাল। রুস্তম মুসলমানদের পক্ষ থেকে তার দরবারে আলোচনার জন্য দূত প্রেরণ করার প্রস্তাব দেয়। রুস্তমের দরবারে উন্নতমানের মূল্যবান গালিচা বিছানো হয় আর পূর্ণ সাজসজ্জার ব্যবস্থা করা হয়। রুস্তমের জন্য স্বর্ণের বিছানা পাতা হয় আর এর ওপর গালিচা বিছিয়ে এবং স্বর্ণের সুতা দিয়ে প্রস্তুত করা বালিশ বিছিয়ে খুব সুসজ্জিত করা হয়। মুসলমানদের পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম হযরত রবী' বিন আমের গিয়ে উপস্থিত হন। রুস্তমের দিকে তাঁর অগ্রসর হওয়ার যে ভঙ্গি ছিল তা হল, নিজের বর্শার ওপর ভর দিয়ে ছোট ছোট পদক্ষেপে হাঁটছিলেন। বর্শার সূচাল অংশের আঘাতে গালিচার গদি ফেটেফেটে যাচ্ছিল আর এভাবে তিনি রুস্তমের কাছে পৌঁছেন আর নিচে বসে নিজ বর্শা গালিচায় সোজা করে গেঁড়ে দেন। হযরত রবী' তিনটি প্রস্তাব রুস্তমের সম্মুখে উপস্থাপন করেন, প্রথমত আপনারা

ইসলাম গ্রহণ করুন, আমরা আপনাদের পিছু ধাওয়া পরিত্যাগ করব আর আপনাদের দেশ নিয়ে আমাদের কোন মাথাব্যথা থাকবে না। নিজ দেশ আপনারাই শাসন করুন। (দ্বিতীয়ত) আমাদেরকে কর দিন তাহলে আমরা আপনাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করব। এ উভয় প্রস্তাবে যদি সম্মত না হন তাহলে আজ থেকে ঠিক চতুর্থ দিন গিয়ে আপনাদের সাথে আমাদের যুদ্ধ হবে। এই তিন দিন আমাদের পক্ষ থেকে যুদ্ধের সূচনা হবে না– তবে শর্ত হল, চতুর্থ দিন যুদ্ধ হলে তো হবে কিন্তু এই তিন দিন আমাদের পক্ষ থেকে যুদ্ধের সূচনা হবে না, তবে আপনারা যদি যুদ্ধ শুরু করে দেন তাহলে আমরা যুদ্ধ করতে বাধ্য হব। পরবর্তী দিন হযরত সা'দ (রা.) হযরত হুযায়ফা বিন মেহসনকে প্রেরণ করেন। তিনিও হযরত রবী'-এর ন্যায় উক্ত তিন প্রস্তাব পুনর্ব্যক্ত করেন। তৃতীয় দিন হযরত মুগীরা বিন শো'বা যান আর তিনিও নিজ কথোপকথনের শেষে নিজ পূর্বোক্ত দুই সাথীর ন্যায় বলেন, ইসলাম গ্রহণ অথবা কর প্রদান করুন নতুবা যুদ্ধের প্রস্তুতির কথা বলেন। তখন প্রত্যুত্তরে রুস্তম বলে, তোমরা অবশ্যই মরবে! তখন হযরত মুগীরা বলেন, আমাদের মাঝে যে নিহত হবে সে জান্নাতে যাবে আর তোমাদের মাঝে যে নিহত হবে সে জাহান্নামে যাবে আর আমাদের মাঝ থেকে যে জীবিত থাকবে সে তোমাদের বিরুদ্ধে সফলতা লাভ করবে। হযরত মুগীরার কথা শুনে রুস্তম চরম ক্রোধান্বিত হয়ে কসম খেয়ে বলে সূর্যের শপথ! আগামীকাল পূর্ণ সূর্য উদিত হবার পূর্বেই আমরা তোমাদের সবাইকে তরবারি দ্বারা খণ্ডবিখণ্ড করব। হযরত মুগীরার পরও কয়েকজন বিচক্ষণ মুসলমানকে হযরত সা'দ (রা.) রুস্তমের দরবারে প্রেরণ করেন যারা সন্ধ্যার সময় প্রত্যাবর্তন করেন।

হযরত সা'দ (রা.) মুসলমানদের সারিবদ্ধ থাকার আদেশ দেন এবং ইরানিদের সংবাদ প্রেরণ করেন যে, নদী পার হওয়া তোমাদের কাজ। যেহেতু সেতুর ওপর মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণ ছিল তাই ইরানিদেরকে অন্য স্থানে আতিক নদীর ওপর সেতু বানাতে হয়। রুস্তম সেতু পার করার সময় বলে, আগামীকাল আমরা মুসলমানদেরকে পদপিষ্ট করব। এক ব্যক্তি বলল, যদি আল্লাহ্ চান তবেই। তার সঙ্গীদের মাঝে কোন একজন একথা বলে, হয়তো আল্লাহ্‌র প্রতি তার বিশ্বাস ছিল। এতে রুস্তম বলে, আল্লাহ্ যদি না-ও চায় তবুও আমরা তাদেরকে পিষে ফেলব, নাউযুবিল্লাহ্। মুসলমানরা ইতোঃমধ্যে তাদের সেনা বিন্যাস সম্পন্ন করেছিল। আর হযরত সা'দ (রা.)'র শরীরে ফোঁড়া বের হয় ফলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এমনকি শায়াটিকা রোগের কারণে তিনি বসতেও পারছিলেন না। তিনি উপুড় হয়ে শুয়ে থাকতেন। তাঁর (রা.) বুকের নিচে বালিশ রাখা থাকত যার ওপর ভর করে তিনি গাছের ওপরে বানানো মাচা থেকে সৈন্যদের পর্যবেক্ষণ করতেন। হযরত সা'দ (রা.) খালেদ বিন আরফাতাকে নিজের নায়েব নিযুক্ত করেছিলেন। হযরত সা'দ (রা.) মুসলমানদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন এবং তাদেরকে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করেন আর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বিজয়ের কথা স্মরণ করান। ইরানি বাহিনী আতিক নদীর তীরে অবস্থান করছিল। আতিক নদী ফুরাত নদী হতে সৃষ্ট একটি শাখা-নদী। মুসলমান সৈন্যরা কোদায়েস প্রাচীর এবং পরিখার পাশে অবস্থান করছিল। কোদায়েস হচ্ছে কাদসিয়ার পার্শ্ববর্তী একটি স্থান যেটি আতিক নদী থেকে প্রায় এক মাইল দূরত্বে অবস্থিত। ইরানি সেনাদের মাঝে ৩০ হাজার সৈন্য শিকলাবদ্ধ ছিল। অর্থাৎ তারা পরস্পর শিকলাবদ্ধ অবস্থায় ছিল যাতে কেউ পলায়ন করার সুযোগ না পায়। হযরত সা'দ (রা.) মুসলমানদেরকে সূরা আনফাল পড়ার আদেশ দেন আর যখন তা পাঠ করা হচ্ছিল তখন মুসলমানরা নিজেদের মাঝে প্রশান্তি অনুভব করে। যোহরের নামাযের পর মুসলমান এবং পারস্য সৈন্যদের মাঝে যুদ্ধ শুরু হয়। তারা মুসলমানদের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করে। বনু তামীম গোত্রের সুদক্ষ তিরন্দাজদের ডেকে হযরত আসেম (রা.) বলেন যে, নিজেদের তির দিয়ে হাতির ওপর আরোহীতদের ওপর আঘাত হানো আর তিনি বীর সৈনিকদের বলেন, হাতির পেছন দিক দিয়ে গিয়ে সেগুলোর হাওদার বাঁধন কেটে ফেল। অতএব, এমন কোন হাতি অবশিষ্ট ছিল না যাদের ওপর সাজসরঞ্জাম ও আরোহী অক্ষত ছিল। সূর্য অস্তমিত হওয়ার পরও যুদ্ধ অব্যাহত ছিল। প্রথমদিন বনু আসাদ গোত্রের পাঁচশ' মুসলমান শহীদ হয়েছিল। সেই দিনকে 'ইয়াওমে আরমাস' বলা হয়। পরবর্তী দিন প্রভাতে হযরত সা'দ (রা.) সমস্ত শহীদদের দাফন করেন এবং আহতদেরকে মহিলাদের হাতে তুলে দেন যাতে তারা তাদের সেবা-শুশ্রূষা করতে পারেন। তখনই মুসলমানরা সিরিয়া থেকে আগত সাহায্যকারী সেনাদল পেয়ে যায়।

হযরত হাশেম বিন উতবা বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.) সেই সাহায্যকারী সেনাদলের নেতৃত্বে ছিলেন। এর অপর অংশে হযরত কাকা বিন আমর আমীর ছিলেন। হযরত কাকা অতি দ্রুত সফর শেষ করে আগওয়াসের প্রভাতে ইরাকের সৈন্যদের সাথে যোগ দেন। হযরত কাকা এই কৌশল অবলম্বন করেন যে, তার সম্মুখ বাহিনীকে দশ জনের দলে বিভক্ত করেন যারা পরস্পর হতে কিছুটা দূরে-দূরে টহল দিচ্ছিল আর পালাক্রমে মুসলমান সৈন্যদের সাথে দশজনের দল মিলিত হত। প্রত্যেক দলের আগমনে নারায়ে তকবীর ধ্বনি ধ্বনিত করা হত আর এমন মনে হচ্ছিল যে, মুসলমান সৈন্যদের ক্রমাগতভাবে সাহায্যকারী সৈন্যদল লাভ হচ্ছে। হযরত কাকা স্বয়ং প্রথম অংশে ছিলেন, সেখানে পৌঁছেই মুসলমানদের সালাম দেন এবং সৈন্যদলের আগমনের সুসংবাদ শোনান এবং বলেন, হে লোকেরা! আমি যা করছি

তোমরাও তাই কর। একথা বলে তিনি সামনে অগ্রসর হন এবং প্রতিদ্বন্দ্বীকে ডাক দেন। এটি শুনে বাহমান জাযবিয়া মোকাবিলা করার জন্য অগ্রসর হয়। দু'জনের মাঝে যুদ্ধ হয় এবং হযরত কাকা তাকে হত্যা করেন। মুসলমানরা বাহমান জাযবিয়ার মৃত্যুতে এবং মুসলমানদের সাহায্যকারী সৈন্যদলের কারণে অনেক আনন্দিত ছিল। হযরত কাকা সম্বন্ধে হযরত আবু বকর (রা.)'র একটি উক্তি হচ্ছে, সেই সেনাদল অপরাজেয় হয়ে থাকে যেখানে তার মত লোক থাকে। সেই দিন ইরানি সেনাবাহিনী নিজেদের হাতির মাধ্যমে যুদ্ধ করতে পারে নি কেননা, সেগুলোর 'হাওদা' (তথা পিঠে নির্মিত তাঁবু) পূর্বের দিন ভেঙ্গে গিয়েছিল।

তাই সকাল থেকেই তারা এটি ঠিক করায় ব্যস্ত ছিল। মুসলমানরা অন্য একটি কৌশলও অবলম্বন করে। তারা নিজেদের উটগুলোকে ঝুলন্ত কাপড় পরিয়ে দেয়, যার কারণে উট পর্দাবৃত হয়ে যায়। উটের ওপর কাপড় দেয়া হয় যার ফলে উটের দেহ এবং গলা সম্পূর্ণ পর্দাবৃত হয়ে যায়। দেখে মনে হচ্ছিল যেন এগুলো হাতি। এই উট যেদিকেই যেত সেদিকেই ইরানিদের ঘোড়া এমনভাবে ভয়ে পালাতে আরম্ভ করত যেভাবে আগের দিন মুসলমানদের ঘোড়া ভয় পাচ্ছিল। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত দুই দলের অশ্বারোহীদের মাঝে যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। আর মধ্যাহ্নের একটু পর থেকে রীতিমত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হয় যা মধ্যরাত পর্যন্ত চলতে থাকে। দ্বিতীয় এই দিনকে 'ইয়াওমে আগওয়াস' বলা হয়। এই দিন মুসলমানরা যুদ্ধে সফল হয়েছিল। তৃতীয় দিন সকালে উভয় সৈন্যদলই তাদের নিজেদের বুহ্যে অবস্থান করছিল। সেদিনও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। মুসলমানদের মোট ২০০০ সৈন্য শাহাদত বরণ করে। অন্যদিকে ইরানি সেনাদলের দশ হাজার সৈন্য নিহত হয়। মুসলমানরা তাদের শহীদদের সাথে সাথে সমাহিত করছিল। আর আহতদের সেবা-শুশ্রূষার জন্য মহিলাদের কাছে হস্তান্তর করছিল। অন্যদিকে ইরানি নিহতদের লাশ সেভাবেই যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে ছিল। সেই রাতে ইরানিরা তাদের হাতির 'হাওদা' ঠিক করায় ব্যস্ত ছিল। পদাতিক সৈন্যরা তাদের হাতির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য হাতির সাথে ছিল। তাই সেসব হাতি সেদিন ততটা ধ্বংসযজ্ঞ সৃষ্টি করতে পারে নি যতটা তারা আগের দিন করেছিল।

হযরত সা'দ (রা.), হযরত কাকা এবং হযরত আসেমকে সংবাদ প্রেরণ করেন যে, ইরানিদের সাদা হাতির হাত থেকে আমাদের বাঁচাও। অতএব হযরত কাকা এবং হযরত আসেম আক্রমণ করে হাতির দুটি চোখেই বর্শা ঢুকিয়ে দেন। ফলে চেতনা হারিয়ে সেই হাতি নিজের আরোহীকে নিচে ফেলে দেয়। হাতির শুঁড় কেটে দেয়া হয়। এরপর তির দ্বারা আক্রমণের মাধ্যমে হাতিকে ভূপাতিত হতে বাধ্য করা হয়। এরপর অন্য মুসলমানরা অপর একটি হাতির চোখে বর্শা ঢুকিয়ে দেয়। এতে কখনও সেটি ছুটে মুসলমান বাহিনীর দিকে আসত তখন তারা তাকে বল্লম বিদ্ধ করত। আবার যখন ইরানি বাহিনীর মাঝে যেত তখন তারা বর্শা বিদ্ধ করত। অবশেষে আজরাব নামক সেই হাতি আতিক নদীর দিকে দৌঁড়াতে শুরু করে, আর এর দেখাদেখি অন্যান্য হাতিরাও সেই হাতির পিছনে পিছনে নদীতে ঝাঁপ দেয়; আর আরোহীসহ সেগুলো মারা যায়। দিনের তৃতীয় প্রহর অবধি এই যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। এই দিনকে 'ইওমে আমাস' বলা হয়।

এশার নামাযের পর পুনরায় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হয়। বলা হয় তখন তরবারির শব্দ এমনভাবে শোনা যাচ্ছিল যেমন কামারের দোকানে লোহা কাটার শব্দ হয়। পুরো রাত হযরত সা'দ (রা.) জাগ্রত থাকেন আর আল্লাহ্‌র সমীপে দোয়ারত থাকেন। আরব ও অনারবরা সেই রাতের মত ঘটনা কখনও প্রত্যক্ষ করে নি। সকাল হওয়ার পরেও মুসলমানদের উৎসাহ-উদ্দীপনা অবিচল ছিল এবং তারা জয়লাভ করে। সেই রাতের পরদিন সকালে সবাই অনেক ক্লান্ত ছিল। কেননা পুরো রাত তারা জেগে কাটিয়েছিল। সেই রাতকে 'লাইলাতুল হারীর' বলা হয়। এই নামকরণের কারণ হিসেবে লিখা হয়েছে যে, সেই রাতে মুসলমানরা নিজেদের মাঝে কথা বলে নি বরং শুধুমাত্র কানাঘুষা করেছে। 'হারীর' শব্দের অর্থের উদাহরণ দিতে গিয়ে লিখা আছে, তির নিক্ষেপের সময় ধনুক থেকে মৃদু শব্দ বের হয় অথবা যাঁতা চালানোর সময় যে মৃদু শব্দ হয় (তা হল হারীর)। তাবারীতেও লাইলাতুল হারীর নামকরণের কারণ হিসেবে এটি লিখা আছে যে, মুসলমানরা সেই রাতে সন্ধ্যা থেকে শুরু করে সকাল পর্যন্ত অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করেছিল। তারা উচ্চস্বরে কথা বলছিল না বরং তারা ক্ষীণস্বরে কথা বলছিল। এই কারণে সেই রাত লাইলাতুল হারীর নামে প্রসিদ্ধি পায়। যাহোক, চতুর্থ দিন সকালে পুনরায় দুপুর পর্যন্ত যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। ইরানিরা ক্রমাগত পিছু হটতে থাকে। এরপর রুস্তমের ওপর আক্রমণ করা হয়। সে আতীক নদীর দিকে পালিয়ে যায়। যখন সে নদীতে ঝাঁপ দেয়, হেলাল নামে একজন মুসলমান তাকে ধরে ফেলে এবং টেনে হিঁচড়ে তীরে নিয়ে এসে হত্যা করে। এরপর রুস্তমকে যে মুসলমান হত্যা করেছিল সে ঘোষণা করতে থাকে যে, আমি রুস্তমকে হত্যা করেছি। আমার দিকে আস। মুসলমানরা তাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলে এবং উচ্চস্বরে নারায়ে তকবীর ধ্বনি ধ্বনিত করে। রুস্তমের নিহত হবার সংবাদ শুনে ইরানিরা পরাজিত হয়ে পলায়ন করে। মুসলমানরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে তাদেরকে হত্যাও করে এবং বড় সংখ্যককে কারাবন্দীও করে। এ দিনটিকে ইয়াওমে কাদসিয়াহ্ বলা হয়। হযরত উমর (রা.) প্রতিদিন সকাল হতেই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বাইরে আগত আরোহীদের কাদসিয়ার যুদ্ধ সম্বন্ধে

জিজ্ঞেস করতেন। যুদ্ধের সুসংবাদবাহক দূত যখন বলে, আল্লাহ্ তা'লা মুশরিকদের পরাজিত করেছেন তখন হযরত উমর (রা.) দৌড়াচ্ছিলেন আর তথ্য নিচ্ছিলেন আর সেই বার্তাবাহক নিজ উটনিতে আরোহিত ছিল আর সে হযরত উমর (রা.)-কে চিনতোও না। অবশেষে সেই দূত যখন মদীনায় প্রবেশ করে এবং মানুষ হযরত উমর (রা.)-কে আমীরুল মু'মিনীন বলে সম্বোধন করছিল আর সালাম দিচ্ছিল তখন বার্তাবাহক হযরত উমর (রা.)-কে নিবেদন করেন, আপনি আমাকে বলেন নি কেন যে, আপনিই আমীরুল মু'মিনীন। হযরত উমর (রা.) বলেন, হে আমার ভাই, কোন ব্যাপার না।

যাহোক, বিজয়ের সংবাদ পাওয়ার পর হযরত উমর (রা.) জনসমাবেশে বিজয়ের সংবাদ পাঠ করে শোনান, অতঃপর এক প্রভাববিস্তারী বক্তৃতা করেন। তিনি নির্দেশনা দিয়ে পাঠান যে, সৈন্যবাহিনী যেন নিজ জায়গায় অবস্থান করে এবং সেনাবাহিনীকে যেন পুনর্বিন্যাস ও পুনর্গঠন করা হয়। এছাড়া সংশোধনযোগ্য অন্যান্য বিষয়ের প্রতিও যেন মনোযোগ দেয়া হয়। হযরত সা'দ (রা.) খলীফার নিকট হতে কিছু দিকনির্দেশনা নিয়েছিলেন। যেমন, কাদসিয়ার যুদ্ধে ইরানিদের পক্ষ থেকে এমন অনেকে ছিল যারা ইতিপূর্বে মুসলমানদের সাথে শান্তিচুক্তি করেছিল। তাদের অনেকেই আবার এ দাবীও করছিল যে, ইরানি সরকার তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক তাদেরকে নিজেদের দলে যুক্ত করে নিয়েছিল অর্থাৎ তারা স্বেচ্ছায় আসে নি বরং বাধ্য হয়ে এসেছিল আর এক্ষেত্রে অনেকের দাবী সঠিকও ছিল। অনেক লোক আবার যুদ্ধের কারণে এলাকা ছেড়ে শত্রুপক্ষের এলাকায় চলে গিয়েছিল এবং ফিরে আসছিল। হযরত উমর (রা.) এসব বিষয়ের সিদ্ধান্তের জন্য মদীনায় মজলিসে শূরা আয়োজন করেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর এই নির্দেশনা দিয়ে পাঠান যে, যারা মুসলমানদের সাথে চুক্তিবদ্ধ ছিল আর তারা চুক্তি বজায় রেখে নিজ এলাকাতেই অবস্থান করেছে, শত্রুপক্ষের সাথে যোগ দেয় নি– তাদের সাথে কৃত চুক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হবে। যারা মুসলমানদের সাথে চুক্তিবদ্ধ ছিল না কিন্তু নিজ এলাকায় অবস্থান করেছে, শত্রুপক্ষ গিয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে সারিতে যোগ দেয় নি তাদের ক্ষেত্রেও ঠিক সেই ব্যবহারই করা হবে যে ব্যবহার চুক্তিবদ্ধদের সাথে করা হচ্ছে। যারা দাবী করে যে, ইরানি সরকার তাদেরকে জোরপূর্বক নিজ সৈন্যদের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে আর তাদের দাবী যদি সত্য প্রতীয়মান হয় সেক্ষেত্রে তাদের সাথেও মুসলমানদের সদাচরণে কোন কার্পণ্য করা হবে না। তাদেরকেও যেন কিছু বলা না হয়। তবে যারা এই দাবীতে মিথ্যাবাদী যে, তাদেরকে বাধ্য করা হয়েছে বরং যদি স্বেচ্ছায় শত্রুর সাথে মিলিত হয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে সেক্ষেত্রে তাদের পূর্বের চুক্তি রহিত হয়ে গেছে কেননা তারা শত্রুপক্ষের সঙ্গ দিয়েছে। তাদের বিষয়ে নির্দেশনা হল, হয় তাদের সাথে পুনরায় সন্ধিচুক্তি হবে নতুবা তাদেরকে তাদের নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেয়া হবে। অর্থাৎ তাদের সাথে পুনরায় চুক্তি করে সেখান থেকে বের করে দেয়া হবে, বসবাসের জন্য তারা যেখানে যেতে চায় চলে যাবে। আর যাদের সাথে কোন চুক্তি নেই আর তারা এই এলাকা ছেড়ে শত্রুর এলাকায় চলে গিয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে তোমরা যদি সমীচীন মনে করো তাহলে তাদেরকেও ডেকে নাও, তারা যেন কর প্রদান করে। যতদূর সম্ভব নম্র আচরণ করতে হবে এবং তারা তোমাদের এলাকায় থাকবে। আর যদি তোমরা সমীচীন মনে কর যে, তোমরা তাদের ডাকবে না আর তারা পূর্বের ন্যায় তোমাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত থাকে তাহলে তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ অব্যাহত রাখ। অর্থাৎ এরপরও যদি তারা সেখানে থাকে এবং যুদ্ধ করতে থাকে তাহলে এক্ষেত্রে তোমাদেরও যুদ্ধ করার অধিকার আছে কিন্তু শত্রুর সাথে হাত মিলানো সত্ত্বেও তারা যদি বিরত হয় তাহলে তাদেরকে ছেড়ে দিবে। এসব নির্দেশনা অনেক কার্যকরী প্রমাণিত হয় এবং আশপাশের লোকেরা ফিরে এসে নিজ নিজ জমিতে বসতি ও চাষাবাদ শুরু করে।

আর (এটি) মহানুভবতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত। কত বড় মহানুভবতা ছিল যে, মুসলমানরা তাদেরকেও নিজেদের জমি চাষাবাদের জন্য ফিরিয়ে আনে যারা অত্যন্ত সংকটপূর্ণ সময়ে নিজেদের সকল চুক্তি লঙ্ঘন করে শত্রুর সাথে হাত মিলিয়েছিল। যদিও মদীনার পরামর্শ সভা তাদেরকে এই বিষয়ের অনুমতি দিয়ে রেখেছিল যে, তোমরা চাইলে এমন ইরানিদের ফিরিয়ে আনতে পার অথবা নাও আনতে পার– সেক্ষেত্রে তাদের জমি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবে অর্থাৎ মুসলমানদের মধ্যে সেসব জমি বণ্টন করে দিবে। ঐতিহাসিকরা উল্লেখ করেছেন যে, এমন সংকটকালে অঙ্গীকার ভঙ্গকারীদের ফিরিয়ে আনা হয় আর তাদের আবাদি জমির ওপর সাধারণ আবাদি জমির চেয়ে বেশি কর বা খাজনা ধার্য করা হয়েছিল। কেবলমাত্র এই একটি শর্তই আরোপ করা হয়েছিল যে, তোমরা চুক্তিভঙ্গ করেছ, (এখন) ফিরে আস (এবং) নিজেদের ভূমি আবাদ কর, কিন্তু এই জমির কর বা খাজনা তোমাদেরকে অন্যদের চেয়ে বেশি দিতে হবে, কিন্তু তারপরও জমির মালিক তোমরাই থাকবে। ইরাকের বিভিন্ন বিজয়ের ক্ষেত্রে এ যুদ্ধটির আঘাত ছিল মোক্ষম। মুসলমান মুজাহিদরা অত্যন্ত অবিচলতা ও বীরত্বের সাথে চরম বৈরী পরিস্থিতি মোকাবিলা করেন।
ঐতিহাসিকরা উল্লেখ করেছেন যে, খিলাফতের দরবার হতে যখন মানুষের জন্য ভাতা নির্ধারিত হয় তখন এক্ষেত্রে কাদসিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণকেও একটি বিশেষ মর্যাদার কারণ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। হযরত উমর (রা.) কাদসিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের অধিক ভাতা নির্ধারণ করেন।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) কাদসিয়ার যুদ্ধের উল্লেখ করতে গিয়ে যা বলেছেন তার মধ্য থেকে কিয়দংশ বর্ণনা করছি।

হযরত উমর (রা.)'র যুগে যখন খসরু পারভেজ-এর পৌত্র ইয়াযদাজারদ সিংহাসনে সমাসীন হয় আর ইরাকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে যুদ্ধের প্রস্তুতি আরম্ভ হয় তখন হযরত উমর (রা.) তাদের মোকাবিলা করার জন্য হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.)'র নেতৃত্বে একটি সৈন্যদল প্রেরণ করেন। হযরত সা'দ (রা.) যুদ্ধের জন্য কাদসিয়ার প্রান্তরকে নির্বাচন করেন আর হযরত উমর (রা.)-কে উক্ত জায়গার মানচিত্র প্রেরণ করেন। হযরত উমর (রা.) এই স্থানটি খুবই পছন্দ করেন, কিন্তু এর পাশাপাশি লিখেন, ইরানের সম্রাটের সাথে যুদ্ধ করার পূর্বে তোমার জন্য আবশ্যক হল, একটি প্রতিনিধিদল ইরানের সম্রাটের কাছে প্রেরণ করে তাকে ইসলাম গ্রহণ করার আমন্ত্রণ জানাও। অতএব, এই নির্দেশ প্রাপ্তির পর তিনি ইয়াযদাজারদের সাথে সাক্ষাতের জন্য একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন। এই প্রতিনিধিদল যখন পারস্য-সম্রাটের দরবারে উপস্থিত হয় তখন সম্রাট তার দোভাষীকে বলেন, এদেরকে জিজ্ঞেস কর, এরা কেন এসেছে? তারা আমাদের দেশে কেন নৈরাজ্য সৃষ্টি করে রেখেছে? সে এই প্রশ্ন করলে প্রতিনিধিদলের নেতা হযরত নু'মান বিন মোকাররিন (রা.) দাঁড়ান এবং তিনি মহানবী (সা.) আবির্ভাবের উল্লেখপূর্বক বলেন, তিনি (সা.) আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন আমরা যেন ইসলামের প্রচার-প্রসার করি আর বিশ্বের সকল মানুষকে সত্য ধর্মে যোগদানের আমন্ত্রণ জানাই। এই নির্দেশ পালনার্থে আমরা আপনার সমীপেও উপস্থিত হয়েছি আর আপনাকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি। এই উত্তর শুনে ইয়াযদাজারদ চরম অসন্তুষ্ট হয় (আর) বলতে আরম্ভ করে, তোমরা এক বন্য ও মৃতখেকো জাতি। ক্ষুধা ও দারিদ্র তোমাদেরকে এই যুদ্ধে আসতে বাধ্য করে থাকলে আমি তোমাদেরকে এত পরিমাণ পানাহার সামগ্রী প্রদানের জন্য প্রস্তুত আছি যে, তোমরা নিশ্চিন্তে নিজেদের জীবন কাটিয়ে দিতে পারবে, এছাড়া তোমাদের পরিধানের জন্য পোশাকও প্রদান করব। তোমরা এসব সামগ্রী নাও আর নিজেদের দেশে ফিরে যাও। আমাদের সাথে যুদ্ধ করে তোমরা কেন নিজেদের প্রাণ বিনষ্ট করতে চাচ্ছ? সে কথা শেষ করার পর ইসলামী প্রতিনিধিদলের পক্ষ থেকে হযরত মুগীরাহ্ বিন যারারাহ্ (রা.) দাঁড়ান এবং তিনি বলেন, আপনি আমাদের সম্পর্কে যা কিছু বলেছেন তা একেবারেই যথার্থ। আসলেই আমরা বন্য এবং মৃতখেকো জাতি ছিলাম। আমরা সাপ, বিচ্ছু, ফড়িং এবং টিকিটিকি পর্যন্ত খেয়ে ফেলতাম কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতি কৃপা করেছেন আর তিনি আমাদের হিদায়াতের জন্য তাঁর রসূলকে প্রেরণ করেছেন। আমরা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি এবং আমরা তাঁর কথার ওপর আমল করেছি, যার ফলে এখন আমাদের মাঝে এক বিপ্লব সৃষ্টি হয়েছে। এখন আমাদের মাঝে সেসব বদভ্যাস নেই যেগুলোর উল্লেখ আপনি করেছেন। এখন আমরা কোন প্রলোভনেই প্রলুব্ধ হব না। আপনার সাথে আমাদের যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখন যুদ্ধক্ষেত্রেই হবে। অর্থাৎ আপনি যদি এটিই চান, আমাদের প্রস্তাবে যদি আপনি সম্মত না হন এবং আমাদের সাথে যুদ্ধ করতে চান, তবে তা-ই সই; আমরাও যুদ্ধ করব। জাগতিক ধনসম্পদের প্রলোভন আমাদেরকে আমাদের সংকল্প থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না। ইয়াযদাজারদ একথা শুনে চরম ক্রোধান্বিত হয়ে তার এক ভৃত্যকে সামনে ডেকে আদেশ দেয়, যাও এক বস্তা মাটি নিয়ে আস। মাটির বস্তা এসে উপস্থিত হলে সে ইসলামী প্রতিনিধিদলের প্রধানকে সামনে আসতে বলে এবং বলে, তুমি যেহেতু আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছ তাই এখন এই মাটির বস্তা ছাড়া তোমরা আর কিছুই পাবে না। (এবিষয়ে পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে, তবে এখানে কিছুটা বিস্তারিত রয়েছে) সেই সাহাবী অত্যন্ত আন্তরিকভাবে এগিয়ে গিয়ে নিজের মাথা নিচু করে মাটির বস্তা পিঠে তুলে নেন। এরপর তিনি লাফ দিয়ে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে দরবারের বাইরে চলে আসেন এবং নিজের সঙ্গীদের উচ্চস্বরে বলেন, আজ পারস্য-সম্রাট নিজ হাতে আমাদেরকে তার দেশের মাটি তুলে দিয়েছেন। এই বলে তারা ঘোড়ায় আরোহণ করে দ্রুতবেগে বেরিয়ে পড়েন। বাদশাহ্ যখন তার এই কথা শোনে, সে কেঁপে ওঠে এবং নিজ দরবারের লোকদেরকে বলে, দৌড়ে গিয়ে তাদের কাছ থেকে মাটির বস্তা ফেরত নিয়ে আস। বাদশাহ্ বলল, কত বড় অলক্ষুণে কাজ হয়েছে! আমি নিজ হাতে এদেশের মাটি তাদের হাতে তুলে দিয়েছি! তবে ততক্ষণে ইসলামী প্রতিনিধিদল ঘোড়ায় চেপে বেশ দূরে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু অবশেষে তাই হয়েছে যা তারা বলেছিল আর কয়েক বছরের মধ্যেই পুরো পারস্য মুসলমানদের করতলগত হয়।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) লিখেন, এই মহান পরিবর্তন মুসলমানদের মাঝে সাধিত হওয়ার কারণ কী ছিল? এর কারণ হল, কুরআনের শিক্ষা তাদের স্বভাবচরিত্রে এক বিপ্লব সাধন করেছিল। তাদের তুচ্ছ জীবনে তা এক মৃত্যু আনয়ন করেছিল আর তাদেরকে এক উন্নত নৈতিকতা ও চরিত্রের উচ্চ মার্গে উপনীত করেছিল; এ কারণেই এ বিপ্লব সাধন হয়েছিল। অতএব কুরআনের শিক্ষার ওপর আমল করার মাধ্যমেই প্রকৃত বিপ্লব সাধিত হয়ে থাকে। ইনশাআল্লাহ্ তা'লা আগামীতেও এই স্মৃতিচারণ অব্যাহত থাকবে।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)

‘রূহানী খাযায়েন’-এর পরিচয়পর্ব

মূলঃ হযরত মাওলানা জালালুদ্দিন শামস সাহেব

ভাষান্তর: মাওলানা আবু সালেহ আহমদ মণ্ডল

দ্বিতীয় কিস্তি

বারাহীনে আহমদীয়া (১-৪)

‘বারাহীনে আহমদীয়া’-এর প্রভাব

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এই কিতাব রচনা করার ফলে মুসলমানদের উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে আহলে হাদীসের নেতৃস্থানীয় এক ব্যক্তি মৌলবী মোহাম্মদ হোসেন বাটালভী উক্ত পুস্তকের বিষয়ে লেখেন: “এখন আমি আমার মতামত সংক্ষিপ্তভাবে কিন্তু কোনরূপ অতিরঞ্জন ছাড়াই ব্যক্ত করছি। আমার মতে এই কিতাব এ যুগে এবং বতমার্ন অবস্থার নিরিখে এমন একটি কিতাব যার ন্যায় অন্য কোন কিতাব আজ পর্যন্ত ইসলামের সেবায় প্রকাশিত হয় নি তবে আগামীতে কী হবে তা আমার অজানা। لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً (“লাআল্লাহু ইউহাদ্দিসু বা’দা যালিকা আমরান।”) *(সূরা আত তালাক: ২)*

এই পুস্তক প্রণেতা নিজ প্রাণ-সম্পদ, রচনাবলী ও বক্তৃতাসমূহ তথা স্বীয় পবিত্র-জীবনাচরণের মাধ্যমে ইসলামের সেবায় এমন অবিচল প্রমাণিত হয়েছে যে, এর দৃষ্টান্ত পূর্ববর্তী মুসলমানদের মাঝে অতি বিরল।

আমার এসব কথাকে কেউ প্রাচ্যের অতিরঞ্জন মনে করলে আমাকে অন্তত এমন একটি গ্রন্থের নাম বলে দিক, যাতে ইসলামের সকল বিরোধী-সম্প্রদায়ের, বিশেষকরে আর্য ও ব্রাহ্মসমাজের এমন জোরালো খণ্ডন থাকবে এবং ইসলামের এমন দু’চারজন সেবকেরও সন্ধান দিক, যারা ধন-প্রাণ এবং কথা ও লেখার মাধ্যমে ইসলামের সাহায্য করার দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে তুলে নেয়া ছাড়াও আদর্শগতক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত স্থাপনের মাধ্যমে ইসলামের পক্ষে দণ্ডায়মান হয়েছেন। আর ইসলাম বিরোধী ও এলহামে অবিশ্বাসীদেরকে পাল্টা বীরত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলে থাকবেন, এলহাম হওয়া সম্পর্কে যার সন্দেহ রয়েছে, সে আমার কাছে এসে এর অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষজ্ঞান লাভ করতে পারে; আবার এই অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষদর্শনের স্বাদ বিজাতীয়দেরকেও আস্বাদন করিয়ে থাকবেন। *(ইশা’আতুস সুন্নাহ, ষষ্ঠ খণ্ড, সপ্তম সংখ্যা, পৃষ্ঠা: ১৬৯-১৭০)*

এ এক মহান কিতাব যা নিজ যুগের চাহিদার প্রেক্ষিতে অতুলনীয় সাব্যস্ত হয়েছে, যার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা ইসলামের সকল বিরোধীদের জন্য অসম্ভব ছিল এবং এর ফলে ইসলামের সুমহান বিজয় অর্জিত হয়। এমন পুস্তক প্রণয়ন ও মুদ্রণে সহযোগীতা করার জন্য মুসলিম ধনী-দরিদ্র, বিশেষ ও সর্বসাধারণের কাছে নিবেদন করা হয় কিন্তু গুটিকয়েক ব্যক্তি এক্ষেত্রে সম্মুখে অগ্রসর হয়। বারাহীনে আহমদীয়ার ১০ থেকে ১২ নং পৃষ্ঠায় বারাহীনে আহমদীয়ার সম্মানিত প্রণেতা (আ.) ঐসকল সহায়তাকারী ব্যক্তিদের নাম তাদের প্রেরিত অর্থের অংকসহ উল্লেখ করেন যা সর্বসাকুল্যে ৫শত রুপির কম হবে। তাদের মাঝে নবাবগণও ছিলেন এবং ধনীরাও ছিলেন। তিনি (আ.) তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে তাদের নাম উল্লেখ করার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে গিয়ে লেখেন: “পৃথিবীর বুকে যতদিন পর্যন্ত এই কিতাব দ্বারা মানুষ উপকৃত হতে থাকবে, যারা এই পুস্তকের দ্বারা উপকৃত হবেন তারা যেন আমাকে এবং আমার সাথে এই কাজে সহায়তাকারীদের নিজেদের দোয়ায় স্মরণ রাখেন।” *(বারাহীনে আহমদীয়া, চতুর্থ খণ্ড, রূহানী খাযায়েন, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৫) ...(চলবে)*

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর অনুপম জীবনের কিছু দিক

মাওলানা আহমদ তারেক মুবাশ্বের

প্রথম কিস্তি

ঐশী শক্তি হতে কল্যাণপ্রাপ্ত হয়ে বক্তব্য

'হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) কাদিয়ানের বার্ষিক জলসার মঞ্চে সর্বপ্রথম ১৯০৬ সনে মাত্র ১৭ বছর বয়সে বক্তব্য প্রদান করেন'- মর্মে রাবওয়া থেকে প্রকাশিত দৈনিক 'আল্ ফযল'-এর ১৮ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ ইং তারিখের সংখ্যায় হযরত মাওলানা আব্দুর রহীম দরদ সাহেব (রা.)-এর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় । হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) স্বয়ং খিলাফতের রজতজয়ন্তী উপলক্ষে ১৯৩৯ সনে সেই তত্ত্বপূর্ণ ও মূল্যবান বক্তব্যের কথা বিষেশভাবে উল্লেখ করেন যার বিষয়বস্তু ছিল, 'ইসলামী শিক্ষার মূল হল তৌহিদ বা একত্ববাদের ঝরণা'। হুযূর (রা.) হৃদয়হরা বক্তব্যে বলেন, "যখন থেকে আমার বক্তৃতা দেওয়ার বা কথা বলার সুযোগ হয়েছে তখন থেকে আমি এ বিষয়টি অনুভব করেছি যে, কৃত্রিমতার সাথে বক্তব্য প্রদান করা আমার জন্য খুবই কষ্টসাধ্য আর আমার অবস্থা এমন হয়ে যায় যাকে বলে, বিচলিত হয়ে পড়া অথবা নার্ভাস হয়ে পড়া। আমার স্মরণ আছে, আমি যখন প্রথম বক্তৃতা প্রদান করি আর এ উদ্দেশ্যে দাঁড়াই, তখন আমার চোখের সামনে অন্ধকার নেমে আসে, এমনকি কিছুক্ষণ তো উপস্থিত লোকদেরও আমি দেখতে পাই নি। কিন্তু পরবর্তীতে আর কখনও এমন অবস্থা সৃষ্টি হয় নি। এক বিশেষ মুহূর্তে আমার হৃদয়ে এক ধরনের ব্যাকুল অবস্থা সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই অবস্থা ততক্ষণ পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে যতক্ষণ বিদ্যুতের সংযোগ বহাল না হয়, তথা প্রথম দিন থেকেই কোন এক মহাশক্তির সাথে আমার মস্তিষ্কের এই সংযোগ সৃষ্টি হয়। আর যখন এরূপ হয় তখন বিশ্বের সকল বড় বড় বক্তা ও বাকপটু ব্যক্তি যারা নিজ নিজ ভাষায় দক্ষ, তাদের সবাইকে আমার সামনে নগণ্য ও তুচ্ছ মনে হতে থাকে, যেন তারা আমার হাতের খেলনা। আমি যখন প্রথম প্রথম বক্তৃতার জন্য দাঁড়াই আর পবিত্র কুরআন থেকে আয়াত পাঠ করতে আরম্ভ করি তখন আমি কুরআনের বাক্যগুলো দেখতে পেতাম না। যেহেতু সেসব আয়াত আমার মুখস্থ ছিল তাই তা আমি পাঠ করতাম। এরপর যখন আমি ধীরে ধীরে বক্তৃতা প্রদানে অভ্যস্ত হই, তখন আমার দৃষ্টিতে সামনের শ্রোতারা অদৃশ্য হয়ে যেত। এরপর অকস্মাৎ এরূপ মনে হল, কোন এক মহাশক্তির সাথে আমার সংযোগ হয়েছে। এমনকি বক্তৃতা শেষ করার পর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) দাঁড়িয়ে বলেন, এই বক্তৃতা শুনে আমি খুবই পুলকিত হয়েছি । তিনি বলেন, আমি অনেক বড় বড় তফসীর পড়েছি এবং আমার পাঠাগারে অনেক দুর্লভ তফসীর সংরক্ষিত রয়েছে, কিন্তু মাহ্মুদ আহমদ (রা.) নিজ বক্তব্যে পবিত্র কুরআনের যে তত্ত্ব বর্ণনা করেছেন, এমন তত্ত্বপূর্ণ তফসীর আমি পূর্বে জানতামও না আর কখনও পড়িও নি।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, 'বক্তৃতা প্রদানের সময় আমার ওপর যখন সেই অবস্থা সৃষ্টি হয় তখন আমি অনুভব করি যে, খোদার কৃপায় সেই ঘণ্টা বাজানো হয়েছে আর এখন আল্লাহ্ তা'লা আমার মন-মস্তিষ্কে এমন তত্ত্বজ্ঞান অবতীর্ণ করবেন যা আমার অজানা। এবং অনেক বার পবিত্র কুরআন পাঠ করার সময়ও আমার ওপর সেই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।' *(রোয়েদাদ জলসা, খিলাফত জুবিলী, পৃষ্ঠা: ৬০-৬১)*

প্রাচীন ঐশী গ্রন্থাবলীতে মাহ্দীর যুগের একটি লক্ষণ হল, এক বাচ্চার (হাতে) বয়আত এবং বিশ্বযুদ্ধসমূহ

রাবওয়া থেকে প্রকাশিত দৈনিক আল্ ফযল-এর ১৮ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ সালের সংখ্যায় প্রকাশিত কাশ্মীর নিবাসী জনাব মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ্ কুরাইশী

সাহেব তার প্রবন্ধে প্রাচীন ঐশী গ্রন্থাবলীর আলোকে যুগ-মাহ্‌দীর লক্ষণাবলী হতে কয়েকটি তুলে ধরেছেন।

বাচ্চার (হাতে) বয়আত এবং যুদ্ধবিগ্রহের সূচনা

প্রতিশ্রুত মাহ্‌দীর আবির্ভাবের লক্ষণাবলী সম্পর্কে পূর্ববর্তী বুযূর্গদের গ্রন্থাবলীতে উল্লিখিত বিভিন্ন রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, 'এক বাচ্চার হাতে বয়আত নেওয়া হবে আর শক্তিধর দেশগুলোতে যুদ্ধ আরম্ভ হবে।' এটি শিয়াদের নির্ভরযোগ্য ও পবিত্র গ্রন্থ 'বিহারুল আনওয়ার'-এ (ত্রয়োদশ খণ্ডের ১৬৫ পৃষ্ঠায়) লিপিবদ্ধ আছে। এই গ্রন্থটি ২৬ খণ্ডে সমৃদ্ধ এবং ইরান থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। উক্ত গ্রন্থে মাহ্‌দীর আবির্ভাবের লক্ষণাবলী সম্পর্কিত অধ্যায়ে আবীল-জারূদের রেওয়ায়েত রয়েছে যে, আমি আবি জা'ফর (রা.)-এর কাছ থেকে শুনেছি, 'যখন বাচ্চার হাতে বয়আত অনুষ্ঠান হবে তখন সকল পরাশক্তি নিজেদের শক্তিমত্তা নিয়ে দণ্ডায়মান হবে।' (অর্থাৎ, শক্তিধর দেশগুলোর মাঝে যুদ্ধ বাঁধবে আর প্রত্যেক পরাশক্তি তাদের নিজ নিজ পেশিশক্তি প্রদর্শন করবে)।

রেওয়ায়েতে 'আস্-সাবী'র বয়আত করার বাক্য এসেছে। জানা কথা, এর অর্থ কোন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বা নাবালক বাচ্চার হাতে বয়আত করা হতে পারে না কেননা, নাবালকের হাতে বয়আত করা বৈধ নয়। কাজেই বাচ্চার হাতে বয়আত করা বলতে এমন কোন বিশেষ যুবকের হাতে বয়আত করা বুঝায়, ইমাম মাহ্‌দীর যুগের সাথে যার সম্পর্ক রয়েছে। অতএব, মাহ্‌দী সম্পর্কে প্রসিদ্ধ হাদীস 'ইয়াতাযাওয়াজু ওয়া ইউলাদুলাহু' (অর্থাৎ, প্রতিশ্রুত মাহ্‌দী বিয়ে করবেন এবং তাঁর সন্তানাদি হবে) দ্বারা উপরোক্ত অর্থের অধিক সমর্থন হয়। আর উভয় হাদীস একত্রে পাঠ করলে সুস্পষ্ট হয় যে, ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর এক বিশেষ পুত্র হবে, যার হাতে বয়আত করা হবে আর তখন বড় বড় পরাশক্তির মাঝে যুদ্ধেরও সূচনা হবে।

একইভাবে 'বিহারুল আনওয়ার' পুস্তকে ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর খলীফাদের কথা উল্লেখ করে লেখা হয়েছে। কায়েম (অর্থাৎ মাহ্‌দীর) পরে তাঁর এক বিশেষ পুত্রের খিলাফত প্রতিষ্ঠার কথা রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে।

মাহ্‌দীর পুত্রকে 'আস্ সাবী' বলার পেছনে বিশেষ প্রজ্ঞা যা অনুধাবন করা যায় তা হল, যখন তার বয়স অল্প বা যৌবনে তার হাতে বয়আত করা হবে তখন কতক লোকে বলবে, 'এ তো বাচ্চা' আর কিছুকাল পরে বলা হবে, দেখো! মানুষ যাকে 'বাচ্চা' বলতো তার দ্বারা কীরূপ কাজের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

কাশ্‌ফ বা দিব্যদর্শনে বাচ্চার হাতে বয়আত করতে দেখার অর্থ

হযরত আবু জা'ফর (রা.)'র উপরোক্ত রেওয়ায়েতটি একটি ভবিষ্যদ্বাণী। আর ভবিষ্যদ্বাণী সাধারণত কাশ্‌ফ বা রূইয়ার সাথে সম্পর্ক রাখে, যা তা'বীর বা ব্যাখ্যার দাবী রাখে। অতএব কাশ্‌ফে বাচ্চার হাতে বয়আত করতে দেখার বিষয়টি সুস্পষ্ট করে যে, এখানে কোন বিশেষ পুত্রের হাতে বয়আত করার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে, যার মাধ্যমে বিরাট বিরাট অসাধ্য সাধিত হবে আর সে বিশেষ বৈশিষ্টের অধিকারী হবে। অতএব, হযরত শাহ্ নিয়ামত উল্লাহ্ ওলী (রহ.)ও এ ধরনেরই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

دَور اُو چوں شود بکام تمام
پسرش یادگار مے بینم

"দওরে উ চুঁ শাওয়াদ বেকাম তামাম,
পেসারাশ ইয়াদগার মি বিনাম"

অর্থাৎ, 'সেই (মাহ্‌দীর) যুগ সফলতার সাথে সম্পন্ন হওয়ার পর আমি তাঁর সন্তানকে তাঁর স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে দেখছি'।

কাজেই, প্রথমত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) ১৯১৪ সনে যখন বয়আত নিয়েছিলেন তখন তিনি ২৫-২৬ বছরের যুবক ছিলেন। ১৯১৪ সনেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়, এরপর ১৯৩৯ সনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত, তিনি ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর সেই বিশেষ পুত্র ছিলেন যার জন্মেরও পূর্বে এ সম্পর্কে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) নিজ ভবিষ্যদ্বাণী ছাপিয়ে দিয়েছিলেন।

তৃতীয়ত, জামা'তের অধিকাংশ লোক যখন তাঁর হাতে বয়আত করেন তখন জামা'তের মধ্যে কতক মানুষ যারা নিজেদেরকে অনেক বড় মনে করত তারা একথা বলে তাঁর হাতে বয়আত করা থেকে বিরত থাকে যে, 'এ তো কালকের বাচ্চা, আমরা কীভাবে তার হাতে বয়আত করব'?

দায়িত্ব পালন

২০১৩ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখের দৈনিক আল্ ফযল সংখ্যায় হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর গুরুত্বের সাথে দায়িত্ব পালনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ সংক্রান্ত একটি নির্দেশনা লিপিবদ্ধ করছি। হুযূর (রা.) বলেন, "খোদা তা'লার কৃপায়ই আমাদের জামা'তের মধ্যে অঙ্গসংগঠন সৃষ্টি হয়েছে, সর্বদা এর ইতিবাচক ফলাফল প্রকাশ পেয়েছে। আমার স্মরণ আছে, এক যুগে যখন কাদিয়ানে বিরুদ্ধবাদীদের জলসা হয়েছিল, তখন তারা তাদের বক্তৃতায় বলেছিল, আমরা বেহেশতি মাকবেরার ওপর আক্রমণ করব আর আহমদীদের কবর উপড়ে ফেলব। নিরাপত্তার জন্য আমি বাইরে থেকে মানুষ ডেকে এনেছিলাম, যারা ছিল কৃষক ও অশিক্ষিত শ্রেণির। রাতেরবেলা আমি এটি দেখতে যাই যে, এরা কেমন পাহারা দিচ্ছে। আমার সাথে প্রয়াত জুলফিকার আলী খান গওহর সাহেবও ছিলেন। হঠাৎ করে একজন কৃষক ভীত-ত্রস্ত অবস্থায় ছুঁটে

আসে আর আমার কোমর ঝাপটে ধরে বলতে আরম্ভ করে, আমি (আপনাকে) সামনে যেতে দিব না। কোন কোন বন্ধু বলেন, ইনি খলীফাতুল মসীহ্। তিনি বলেন, আমি জানি না ইনি খলীফাতুল মসীহ্ কি-না? আমার ডিউটি হল, এখান দিয়ে আমি কাউকে সামনে যেতে দিব না যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি তার পাসওয়ার্ড বলবেন অথবা সে ডিউটি ব্যাজ পরিধান না করবে। যারা বলেছিল, ইনি খলীফাতুল মসীহ্ আমি সেসব বন্ধুকে ভর্ৎসনা করি এবং বলি, এই লোক যা কিছু করেছে তা একেবারে ঠিক করেছে। তার কর্তব্যই ছিল কাউকে সম্মুখে যেতে না দেওয়া। এরপর সেই পাহারাদার বলে, আমাকে নির্ধারিত পাসওয়ার্ড বলুন? যাহোক এরপর তার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা আসেন এবং পাসওয়ার্ড বলেন, তখন সেই পাহারাদার বলেন, এবার আপনি ভেতরে যেতে পারেন। আমি এই লোকের প্রশংসা করি এবং বলি সে পুরস্কার লাভের যোগ্য। *(আল্ ফযল, ২৪শে জানুয়ারি, ১৯৫৯, পৃষ্ঠা: ৩)*

সময়ের মূল্য দেওয়ার পন্থা

রাবওয়া থেকে প্রকাশিত জুলাই, ২০১১ সালের মাসিক 'মিসবাহ্' সংখ্যায় সময়ের মূল্য অনুধাবন করা সম্পর্কে সৈয়্যদনা হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর একটি চমৎকার উদ্ধৃতি এখানে যুক্ত করছি। হুযূর (রা.) বলেন, "কয়েকদিন নিজের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডের ডায়েরি লিখুন। দিনকে তিনটি অংশে বিভক্ত করুন আর প্রতিটি অংশ শেষ হওয়ার পর পাঁচ-দশ মিনিট পর্যন্ত নোট করুন যে, আপনি এই সময়ে কী কী করেছেন। এভাবে লাগাতার আট-দশদিন ডায়েরি লেখার পর পুনরায় নিজের ডায়েরির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দেখুন, এর মধ্যে কোন কোন কাজ অপ্রয়োজনীয় ছিল। অনুমান করুন যে, প্রতিদিন কতটুকু সময় আপনি প্রয়োজনীয় কাজে এবং কতটুকু সময় অপ্রয়োজনীয় কাজে ব্যয় করেছেন। এভাবে অতি সহজেই আপনি বুঝতে পারবেন যে, আপনার জীবনের একটা বড় অংশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।"

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)'র স্মৃতিচারণ

প্রয়াত শ্রদ্ধেয় মৌলবী সৈয়দ ফযলে উমর সাহেব অনেক দোয়াগো, তাহাজ্জুদগুযার এবং খিলাফতের প্রতি ভালবাসায় সমৃদ্ধ একজন বুযূর্গ ছিলেন। দরবেশ হিসেবেও তাঁর সেবা করার সৌভাগ্য হয়েছে। শ্রদ্ধেয়া সৈয়দা রাজিয়া বেগম সাহেবাকে তিনি বিয়ে করেন আর আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে পাঁচ পুত্র এবং চারজন কন্যা-সন্তান দান করেন। কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'বদর' পত্রিকার ৯ই ফেব্রুয়ারি, ২০১২ সংখ্যায় হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর স্মৃতিচারণের বরাতে প্রয়াত মৌলবী সাহেব রচিত একটি প্রবন্ধ এখানে যুক্ত করছি। তিনি লিখেন, "১৯৪৪ সনে এই অধম তার পিতা প্রয়াত শ্রদ্ধেয় সৈয়্যদ আব্দুল মু'নিম সাহেব (সোঙ্গড়া'র সাবেক আমীর)-এর আকাঙ্ক্ষানুসারে জীবন উৎসর্গ করে। ১৯৪৫ সনে শ্রদ্ধেয় আব্দুর রহমান আনওয়ার সাহেব চিঠি লিখে জানান, সাক্ষাতকারের জন্য হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)'র সকাশে উপস্থিত হও। যথা আজ্ঞা, আমি উপস্থিত হই এবং তাঁর পবিত্র হাতে চুমু খাই। হুযূর (রা.) আমার আপাদমস্তক দেখেন আর ধর্মসেবার জন্য (আমাকে) গ্রহণ করেন। এটুকুই ছিল সাক্ষাতকার। তরবীয়তের সূচনা হয়, কয়েক মাস পরে। আমার খোস-পাঁচড়া হয় আর কয়েকদিন পর্যন্ত জ্বর থাকে। এ কারণে আমাদের সহকারী ইনচার্জ আমাকে বাড়ি চলে যেতে বললে আমার অনেক দুঃখ হয়। আর আমি সাক্ষাতের অভিপ্রায়ে কাসরে খিলাফতে যাই এবং হুযূর (রা.)-এর কাছে আমার অসুস্থতার কথা বলি। হুযূর (রা.) বলেন, আবওহাওয়া এবং খাদ্যের পরিবর্তনের কারণে এই রোগ হয়েছে, ঠিক হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ্। এরপর ফিরে এসে আমি আমার সহকারী ইনচার্জকে হুযূরের নির্দেশনা জানালে তিনি নীরব হয়ে যান। খোদা তা'লা হুযূর (রা.)-এর দোয়া কবুল করেন আর আমাকে আরোগ্য দান করেন।

উড়িষ্যা প্রদেশ থেকে আমিই প্রথম জীবন উৎসর্গকারী আহমদী ছিলাম। খোদা তা'লার অপার অনুগ্রহে ৩৬ বছর ধর্মসেবার তৌফিক লাভ হয়। অধমের পিতা সালেহ্পুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ১৯৪১ সনে তিনি Popular History of India নামে একটি পুস্তক রচনা করেছিলেন আর একদা আমি তা হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর সমীপে পেশ করি। (পুস্তকটি) পাঠ করার পর হুযূর (রা.) গভীর আনন্দের বহিঃপ্রকাশ ঘটান আর জিজ্ঞেস করেন, এই পুস্তক আপনার পিতা কি আহমদীয়াত গ্রহণের পূর্বে রচনা করেছিলেন না-কি পরে? অধম নিবেদন করে, তিনি জন্মগত আহমদী। একইভাবে অধম তার পিতার পুস্তক Ahmad of QadianI (হুযূরের) সমীপে পেশ করে।

একবার সাক্ষাতকালে আলাপচারিতার সময় হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) উড়িষ্যার জামা'তগুলোর সংখ্যা সম্পর্কে জানতে চাইলে আমি বিস্তারিত উত্তর দিয়ে বলি, উড়িষ্যাতে যদি এই পদ্ধতিতে তবলীগ করা হয় তাহলে অনেক লাভ হবে। তখন হুযূর বলেন, "ঠিক আছে, আপনি আপনার ঊর্ধ্বতন কর্মকতার সাথে কথা বলুন।" এই ছিল জামা'তের ব্যবস্থাপনার প্রতি হুযূর (রা.)-এর শ্রদ্ধাশীল থাকার রীতি। ... *(চলবে)*

সীরাতুল মাহদী (আ.)

প্রণেতা: হযরত মির্যা বশির আহমদ এম.এ. (রা.)

ভাষান্তর: **মাওলানা জুবায়ের আহমদ**

(৯ম কিস্তি)

৫০) বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম: খাকসার বর্ণনা করছি, চিকিৎসাশাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন আমাদের পারিবারিক ঐতিহ্য আর বরাবরই আমাদের বংশ এই জ্ঞানে পারদর্শী। দাদাজান অত্যন্ত দক্ষ, স্বনামধন্য ও বিজ্ঞ চিকিৎসক ছিলেন। বড় চাচাও চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-ও চিকিৎসাবিদ্যায় বিশেষ দক্ষতা রাখতেন আর ঘরের মাঝে ঔষধের একটি সংগ্রহশালা ছিল যা থেকে অসুস্থদের পথ্য প্রদান করতেন। মির্যা সুলতান আহমদ সাহেবও চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। খাকসারকে একবার খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন যে, আমাকেও একবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যায়নের নির্দেশ দিয়েছিলেন। খাকসার বর্ণনা করছি যে, যদিও চিকিৎসাবিদ্যা আমাদের পারিবারিক ঐতিহ্য ছিল তথাপি আমাদের পরিবারের কেউ কখনও এই বিদ্যাকে নিজ উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে বেছে নেয় নি আর না চিকিৎসার পর কারও কাছ থেকে কখনও বিনিময় গ্রহণ করেছেন।

৫১) বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম: হযরত আম্মাজান আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তোমাদের দাদি এয়মা জেলার হুশিয়ারপুরের অধিবাসী ছিলেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলতেন, শৈশবে আমি আমার মায়ের সাথে কয়েকবার হুশিয়ারপুরের এয়মা গিয়েছিলাম। হযরত আম্মাজান বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) শৈশবে সেখানে পাখি শিকার করতেন আর ছুরি না পেলে নলখাগড়া দিয়ে জবাই করে ফেলতেন। আম্মাজান বলেন, একবার এয়মা থেকে কিছু বৃদ্ধ মহিলা আসে আর তারা কথায় কথায় বলে যে, 'সিন্ধী' আমাদের গ্রামে পাখি ধরত। আম্মাজান বলেন, 'সিন্ধী' বলতে তারা কাকে বুঝিয়েছে তা আমি প্রথমে বুঝতে পারি নি। অবশেষে জানতে পারলাম, 'সিন্ধী' বলতে তারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে বুঝিয়েছে। আম্মাজান বলতেন, গ্রামে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী অনেকে মানত করে (বিশেষকরে মহিলারা) নিজ সন্তানের নাম 'সিন্ধী' রাখত। অতএব এই কারনেই মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মা এবং কতক অন্যান্য মহিলা মসীহ্ মাওউদ (আ.)- কেও শৈশবে কদাচিত এই নাম ধরে ডাকত। খাকসার বর্ণনা করছি যে, 'সিন্ধী' সম্ভবত দাসওয়ান্ধী অথবা দাসবান্ধী শব্দের বিবর্তিত রূপ যা এমন শিশুকে বলা হয় যার ওপর কোন মানতের ফলে দশবার কোন (সুতা বা তাবিজ) বাধা হয়। আবার কখনও কখনও কোন রকম মানত ছাড়াই মহিলারা আদর করে নিজের সন্তানকে 'সিন্ধী' বলে ডাকা শুরু করে দেয়।

(এই বর্ণনায় যেমনটি উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) শৈশবে কখনও কখনও শিকার করা পাখি নলখাগড়া দিয়ে জবাই করতেন। এ প্রসঙ্গে একটি কথা প্রণিধানযোগ্য যে, এখানে নলখাগড়া দ্বারা পুরো গোল নলখাগড়া বুঝানো হয় নি বরং এক টুকরো ফালি করা নলখাগড়া বুঝানো হয়েছে যা কখনও কখনও এত বেশি ধারালো হয় যে, সাধারণ ছুরিও এর কাছে পাত্তা পায় না। অতএব শৈশবে খাকসারের কয়েকবার নলখাগড়া দিয়ে হাত কেটে যাওয়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে। আর একটা পাখির চামড়া এত বেশি পাতলা হয় যে, সামান্য স্পর্শ লাগলেই তা কেটে যায়।

এই বর্ণনায় উল্লিখিত 'সিন্ধী' শব্দটি দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয়। অর্থাৎ এই শব্দটি দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? আর সেই মহিলাদের পরিচয় কী, যারা হযরত আম্মাজানের সামনে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সম্পর্কে এই শব্দ ব্যবহার করেছে? এই মহিলাদের সম্পর্কে আমি হযরত আম্মাজানকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তাদের পরিচয় আমাদের জানা নেই। আমি শুধু এতটুকু জানি যে, তারা কাদিয়ানের বাইরে থেকে এসেছিল। আর তারা নিজেদেরকে এয়মা জেলার হুশিয়ারপুর নিবাসী বলে পরিচয় দিত। এছাড়া আমি তাদের সম্পর্কে আর কিছুই জানি না। আর এই 'সিন্ধী' শব্দটি নিয়ে খাকসার অনেক গবেষণা করেছি। এটি একটি হিন্দি শব্দ যার অর্থ সঠিক সময় অথবা শান্তি অথবা জোড়া। অতএব যদি এই বর্ণনা সঠিক হয়

তাহলে শৈশব থেকেই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সম্পর্কে কখনও কখনও এই শব্দটি ব্যবহার হওয়ার নেপথ্যে হয়তো আল্লাহ্ তা'লার এই অভিপ্রায় ছিল যে, এই সেই প্রতিশ্রুত ব্যক্তি নির্ধারিত সময়ে যার আগমনের কথা ছিল অথবা এই সেই ব্যক্তি যিনি আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে শান্তি ও নিরাপত্তার বার্তা নিয়ে আবির্ভূত হবেন ('ইয়াযাউল হারব' হাদীসটি দ্রষ্টব্য) অথবা হতে পারে, এই ব্যক্তি বান্দাকে তার প্রভুর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করিয়ে দিবে অথবা হতে পারে, এই ব্যক্তি যমজ জন্মগ্রহণ করবে (মসীহ্ মাওউদ সম্পর্কে এই ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যে, তিনি যমজ জন্মগ্রহণ করবেন)। অতএব যদি এই বর্ণনা সঠিক হয় সেক্ষেত্রে আমি মনে করি, এইসব ইশারা-ইঙ্গিতের মূল উদ্দেশ্য এটিই। বাকিটা আল্লাহ্ ভাল জানেন।

বাকি রইল, কিছু বৈরি মনমানসিকতার লোকদের এমন রসিকতা করা যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নামই 'সিন্ধী' ছিল। এর উত্তর এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন নামের মাঝে ধর্ম ও নৈতিকতা পরিপন্থি কিছু না থাকবে ততক্ষণ কোন ভদ্র ঘরের সন্তান তার ওপর আপত্তি করতেই পারে না। পূর্ববর্তী নবীদের নামসমূহ তো কোন না কোন ভাষারই শব্দ। অন্ততপক্ষে কতক নাম এমন রয়েছে যেগুলোর অর্থই আমাদের অজানা। অতএব মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যদি কোন হিন্দি নাম থেকে থাকে তাহলে আপত্তির কি আছে! কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, এই কথাটি একেবারেই ভিত্তিহীন আর নিতান্তই অপবাদ আরোপ ব্যতিত আর কিছুই নয় যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নাম 'সিন্ধী' ছিল। যদি কোন বিরুদ্ধবাদী অথবা কোন শত্রুভাবাপন্ন ব্যক্তির কাছে এর কোন প্রমাণ থেকে থাকে তাহলে সে দৃঢ়চিত্তে সামনে আসুক আর তা উপস্থাপন করুক। নয়তো আল্লাহ্‌র আযাবকে ভয় কর যা মিথ্যাবাদীদের জন্য অভিসম্পাত হিসেবে নির্ধারিত আছে। প্রকৃত বিষয় হল, পুরো জগত অবগত আছে যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নাম ছিল মির্যা গোলাম আহমদ। অতএব (১) এই নামই তাঁর (আ.) পিতা-মাতার রাখা নাম (২) মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পিতা সর্বদা তাঁকে এই নামেই ডাকতেন (৩) এই নামেই সব বন্ধু আর শত্রুরা তাঁকে (আ.) স্মরণ করত (৪) আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সিয়ালকোটে চাকুরি সংক্রান্ত (১৮৬৪-১৮৬৮) সালের কিছু সরকারি নথিপত্র দেখেছি যা এখন পর্যন্ত সংরক্ষিত আছে। তার মাঝেও এই নামই (মির্যা গোলাম আহমদ) উল্লেখ রয়েছে। (৫) এই নামের ওপর ভিত্তি করেই দাদাজান তার একটি গ্রামের নামকরণ করেছিলেন আহমেদাবাদ (৬) দাদাজানের তিরোধানের পর সম্পত্তি হস্তান্তরের সময় যখন আমাদের বড় চাচা ও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নাম নথিপত্রে নিবন্ধিত হয়, সেখানেও শুধুমাত্র গোলাম আহমদ নামই ব্যবহৃত হয়েছে। আর এটি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মসীহ্ হওয়া সংক্রান্ত দাবির ১৪ বছর পূর্বে ১৮৭৬ সালের ঘটনা (৭) সরকারের পক্ষ থেকে প্রকাশিত পাঞ্জাব চিফ-এর বইয়ের মাঝেও এই নামই উল্লেখ রয়েছে (৯) অন্যান্য প্রিয় ও নিকটাত্মীয়দের নামের নিরীক্ষণ এই নামকেই সমর্থন করে (১০) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজে তার সমস্ত চিঠিপত্র, রচনাসমগ্র আর লেখার মাঝে সর্বত্র এই নামই ব্যবহার করেছেন (১১) বিভিন্ন কর্মকর্তা ও বিরোধীদের পক্ষ থেকে ইংরেজদের উচ্চ আদালতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ওপর যতরকম মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে, প্রত্যেকটিতে এই নামই ব্যবহৃত হয়েছে। (১২) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দাবির পূর্বেই মুহাম্মদ হোসেন বাটালভী সাহেব যে সর্বাগ্রে অস্বীকারকারী ছিল, সে তার লেখা বারাহীনে আহমীয়ার রিভিউ-এর মাঝেও এই নামই ব্যবহার করেছে (১৩) তীব্র শত্রুতা পোষণকারী মৌলবী সানাউল্লাহ অমৃতসরী তার বিরোধিতাপূর্ণ রচনার মাঝেও সর্বদা এই নামই ব্যবহার করেছে (১৪) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর তিরোধানে বিশটি হিন্দু, খ্রিষ্টান এবং মুসলমানদের পত্রিকায় তাঁর (আ.) সম্পর্কে প্রতিবেদন ছেপেছে। তারা প্রত্যেকেই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে এই নামেই সম্বোধন করেছে। এমন স্পষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও যদি কোন নির্বোধ শত্রুভাবাপন্ন ব্যক্তির নিকট হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নাম গোলাম আহমদ না হয়ে 'সিন্ধী' অথবা অন্য কিছু হয়, তাহলে তার জন্য আমাদের পক্ষ থেকে **'লানাতুল্লাহি আলাল কাযিবীন'** বলা ব্যতিত আর কোন গত্যন্তর নেই।... *(চলবে)*

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, চট্টগ্রামের দপ্তরে একজন "অফিস সহকারী কাম মোয়াজ্জিন ও একজন খাদেম (গেইট কিপার)" নিয়োগের জন্য আহমদী প্রার্থীদের নিকট থেকে স্বহস্তে লিখিত আবেদনপত্র আহ্বান করা যাচ্ছে।

অফিস সহকারী কাম মোয়াজ্জিন পদের জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচ. এস. সি পাশ এবং কম্পিউটার দক্ষতা হিসেবে এম. এস. অফিস এবং বাংলা ও ইংরেজি টাইপিং জানা আবশ্যক। এছাড়া সুললিত কণ্ঠে আযান দেওয়ার দক্ষতা থাকা প্রয়োজন।

খাদেম (গেইট কিপার) পদের জন্য ন্যূনতম ৮ম শ্রেণি পাশ এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে।

স্থানীয় আমীর অথবা প্রেসিডেন্ট সাহেবের সুপারিশসহ আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, চট্টগ্রাম বরাবর লিখিত আবেদপত্র আগামী ১৫ই অক্টোবর ২০২১-এর মধ্যে চট্টগ্রাম জামা'তের দপ্তরে পৌঁছাতে হবে।

বেতন ও ভাতা আলোচনাসাপেক্ষে।

আবেদন পাঠানোর ঠিকানাঃ

আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, চট্টগ্রাম

১নং কে. বি. ফজলুল কাদের রোড, চকবাজার চট্টগ্রাম-৪২০৩, বাংলাদেশ

আবেদনের শেষ তারিখ : ১৫ই অক্টোবর, ২০২১

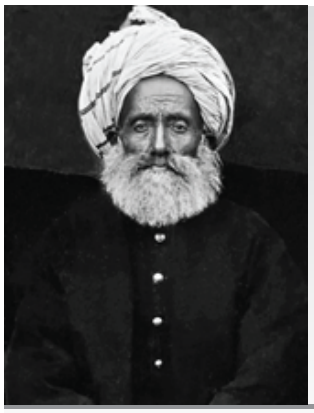

একজন শাহ্‌যাদার সত্য কাহিনী

মূল: হাফেয মোজাফ্‌ফর আহমদ

ভাষান্তর: **মাওলানা আরিফুর রহিম**

৫ পর্বের দ্বিতীয় পর্ব

শাহ্‌যাদা সাহেব যখন কাবুলে ফিরে গেলেন তখন নিজের বিশেষ শিষ্যদেরকে কাদিয়ানের অবস্থা দেখার জন্য পাঠানো শুরু করলেন। ডিসেম্বর ১৯০০ সালে শাহ্‌যাদা সাহেব মৌলবী আব্দুর রহমান সাহেবকে এবং আরও কয়েকজন শিষ্যসহ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নিকট নিজের বয়আতের পত্র পাঠান আর সঙ্গে হুযূরের জন্য উপঢৌকন হিসেবে খুব সুন্দর দামি কাপড় পাঠিয়ে দেন।

শাহ্‌যাদা সাহেবের অনুগত শিষ্য মৌলবী আব্দুর রহমান সাহেব তাঁর বলার প্রেক্ষিতে কয়েকবার কাদিয়ান গিয়েছিলেন এবং নিজেও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করে জামা'তে আহমদীয়ায় শামিল হয়েছিলেন। তিনি ১৯৯০ সালে শেষবারের মত কাদিয়ান গিয়েছিলেন আর ফেরার পথে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কিছু পুস্তক সাথে নিয়ে এসেছিলেন। বাদশাহ্‌র কাছে তার বিরুদ্ধে কেউ অভিযোগ করে যে, মৌলবী আব্দুর রহমান সাহেব অনুমতি ছাড়া কাদিয়ান গিয়েছিলেন। বাদশাহ্ তাকে কয়েদ করার আদেশ দিলেন আর বিষয়টি মোল্লাদের ওপর ছেড়ে দিলেন। তারা মৌলবী আব্দুর রহমান সাহেবের ওপর কুফরী ফতোয়া লাগিয়ে ওয়াজেবুল কতল তথা হত্যাযোগ্য অপরাধী বলে রায় দেয়। এর প্রেক্ষিতে তাঁকে কয়েদ থাকা অবস্থায় গলায় কাপড় পেঁচিয়ে শ্বাসরোধ করে শহীদ করে দেওয়া হয়, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

আমীর আব্দুর রহমানের পরে যখন তার ছেলে হাবীবুল্লাহ্ খাঁন বাদশাহ্ হলেন তখন শাহ্‌যাদা সাহেব হজ্জে যাওয়ার জন্য অনুমতি চাইলেন, নতুন বাদশাহ্ যিনি তাঁর শিষ্যও ছিলেন, তিনি খুশিতে অনুমতি দিয়ে দিলেন আর কিছু উট, ঘোড়া এবং নগদ তোহফা দিয়ে তাকে কাবুল থেকে রওনা করে দিলেন। শাহ্‌যাদা সাহেব নিজের দেশ হয়ে বান্নুর রাস্তা দিয়ে হিন্দুস্তান আসেন। এই সফরে তাঁর সঙ্গে কয়েকজন শিষ্যও ছিলেন।

আটাক-এর নিকটবর্তী একটি স্থানে এক ব্যাক্তির সাথে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিষয়ে শাহ্‌যাদা সাহেবের কথা হয়। এমনটি মনে করা হয়ে থাকে যে, ঐ ব্যক্তি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে মেনে নিয়েছিলেন এবং এ বিষয়ে তিনি খুবই আনন্দিত ছিলেন। শাহ্‌যাদা সাহেব নিজের আরোহীকৃত ঘোড়া তাকে তোহ্‌ফা হিসাবে দিয়ে দিলেন। যখন তিনি লাহোরে পৌঁছালেন তখন জানতে পারলেন যে, প্লেগ ছড়িয়ে পড়া ও অন্য কিছু কারণে হজ্জে যাওয়ার কিছু প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে। এজন্য তিনি লাহোর অবস্থানের পরিবর্তে কাদিয়ান গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে সাক্ষাতের ইচ্ছা পোষণ করেন। শাহ্‌যাদা সাহেব লাহোর থেকে বাটালা আসেন এবং বাটালা থেকে পায়ে হেঁটে কাদিয়ান পৌঁছান। সর্বপ্রথম তিনি হযরত মাওলানা হাফেয নূরুদ্দীন সাহেব (রা.)-এর সাথে সাক্ষাত করেন এবং যোহরের নামাযের পর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে সাক্ষাত করেন। তিনি পূর্বেই পত্রের মাধ্যমে বয়আত করেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর সাথে প্রথমবার সাক্ষাতের অবস্থা বর্ণনা করেন। তিনি (আ.) লেখেন, "কসম সেই খোদার যার হাতে আমার প্রাণ! যখন তার সাথে আমার সাক্ষাত হয় তখন আমি তাকে আমার প্রতি অনুগত ও আমার দাবীর সত্যায়নকারীরূপে এমন আত্মহারা ও বিলীন পেয়েছি যে স্তর অতিক্রম করা কোন মানুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) শাহ্‌যাদা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনি কী দেখে আমার বয়আত করেছেন ? তখন তিনি বললেন সর্বপ্রথম কুরআন শরীফ আমাকে পথ দেখিয়েছে। আমি দেখেছি যুগের লোকেরা ধর্ম থেকে দূরে সরে গেছে এবং শির্ক ও বিভিন্ন ধরনের গুনাহ্‌ও করে থাকে এবং অন্যান্য ধর্মের লোকেরা

ইসলামের ওপর বিভিন্ন ধরনের আপত্তি উত্থাপন করছে। এজন্য এখন খোদার পক্ষ হতে কোন মোজাদ্দেদ আসার সময় হয়ে গেছে। আমি এ বিষয়ে চিন্তা করতাম আর সেই সময়ই আমি জানতে পারি যে, কাদিয়ান নামক গ্রামে এক ব্যক্তি মসীহ্ মাওউদ হওয়ার দাবী করেছেন আর আমি আপনার কিছু পুস্তক সংগ্রহ করি এবং সেগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ি। তখন আপনার প্রত্যেকটি কথা সত্য ও কুরআন অনুযায়ী পেয়েছি। এজন্যই আমি আপনাকে সত্য মেনে গ্রহণ করেছি।

শাহ্‌যাদা সাহেব ১৯০২ সালে কাদিয়ান আসেন এবং প্রায় সাড়ে তিন মাস কাদিয়ান অবস্থান করেন। তিনি প্রতিদিন বাজামা'ত নামায কাদিয়ানের মসজিদ মোবারকে আদায় করতেন। কুরআনের প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসা ছিল। তিনি মেহমানখানায় নিজ কক্ষের বাইরে বসে থাকতেন এবং কুরআন তিলাওয়াত করতে থাকতেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) প্রতিদিন সকালে ভ্রমণের জন্য যেতেন আর তখন শাহ্‌যাদা সাহেবও সঙ্গে থাকতেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসা ছিল এবং তিনি হুযূর (আ.)-কে খুবই সম্মান করতেন। হুযূর (আ.)-এর সাথে ভ্রমণ করে যখন ফিরে আসতেন তখন শাহ্‌যাদা সাহেব নিজের কাপড়ের ধূলাময়লা সেই সময় পর্যন্ত পরিষ্কার করতেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি অনুমান করে নিতেন যে, হুযূর (আ.) ভিতরে গিয়ে নিজের কাপড় পরিষ্কার করে নিয়েছেন।

শাহ্‌যাদা সাহেব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে জেহলামে একটি সফরও করেন। হুযূর (আ.)-কে একটি মামলার সাক্ষীর জন্য জানুয়ারি ১৯০৩ সালে জেহলাম যেতে হয়েছিল। জেহলাম স্টেশনে দশ হাজার মানুষ হুযূর (আ.)-কে স্বাগত জানায়। হুযূর (আ.) জেহলামে তিন দিন অবস্থান করেন আর ঐ দিনগুলিতে দেড় হাজার মানুষ বয়আত করে আহমদীয়াতে শামিল হয়।

১৭ই জানুয়ারি জেহলামে হুযূর (আ.) কোর্টে উপস্থিত হন। সেই দিন সেখানে অনেক মানুষ একত্র হয়েছিল। হুযূর (আ.) একটি চেয়ারে বসেছিলেন আর শাহ্‌যাদা সাহেব হুযূর (আ.)-এর পায়ের কাছে বসেছিলেন। শাহ্‌যাদা সাহেব একটি সুন্দর প্রশ্ন করেন যে, হুযূর ! আমি সর্বদা আপনার সত্যতা সূর্যের ন্যায় আলোকিত দেখি, এটিতে আমার কোন সন্দেহ নেই। এজন্য আমি কি কোন প্রতিদান পাব?

হুযূর (আ.)-ও কত সুন্দর উত্তর দিলেন! তিনি বললেন, "আপনি সেই সময় দেখেছেন যখন কেউই দেখতে পেত না, আর আপনি নিজেই নিজেকে বিপদে নিক্ষেপ করেছেন এবং এই পথে সকল প্রকার দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছেন। এজন্য আল্লাহ্ আপনার প্রতিদানকে বিনষ্ট হতে দেবেন না।"

এই সফরেরই ঘটনা, এক রাতে শাহ্‌যাদা সাহেব তাঁর সঙ্গীদের কাছে আসলেন এবং বললেন, আমার প্রতি বারবার এই এলহাম হচ্ছে যে, **"মাথা দিয়ে দাও, মাথা দিয়ে দাও"**।

সফর থেকে ফিরে আসার পর শাহ্‌যাদা সাহেব অল্প কয়েকদিন কাদিয়ানে ছিলেন। এরপর নিজ দেশের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান।

হুযূর (আ.) তাঁর বিষয়ে বলেন, যদিও তিনি বেশি দিন আমার পাশে থাকার সুযোগ পান নি কিন্তু যতদিনই তিনি এখানে ছিলেন আমার কাছ থেকে অনেক বেশি কল্যাণ লাভ করেছেন।

শাহ্‌যাদা সাহেবের হযরত হাফেয মৌলবী নূরুদ্দীন সাহেব (যিনি জামাতে আহমদীয়ার প্রথম খলীফা হয়েছিলেন)-এর সাথে ভালবাসাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল এবং তাঁকেও সম্মান করতেন। যখন তিনি নিজ দেশে ফিরে যাচ্ছিলেন তখন হযরত মৌলবী নূরুদ্দীন সাহেবের নিকট আবেদন করলেন যে, আমাকে বুখারী শরীফের কয়েকটি হাদীস পড়িয়ে দিন এবং বহুবার অনুনয় বিনয় করে বুখারী শরীফের দুই-তিন পৃষ্ঠা তাঁর থেকে পড়ে নেন আর পরবর্তিতে নিজের শিষ্যদেরকে বললেন, আমি এই পৃষ্ঠাগুলো তাঁর কাছ থেকে এজন্য পড়েছি যাতে করে হযরত মৌলবী সাহেবের শিষ্যদের মধ্যে শামিল হতে পারি, কেননা হযরত সাহেবের পর তিনিই প্রথম খলীফা হবেন।... *(চলবে)*

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

"পাক্ষিক আহ্‌মদী" পত্রিকার সম্মানিত গ্রাহকগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, গ্রাহকগণের অনেকেরই গত বছরের গ্রাহকচাঁদা বাকি পড়েছে। তাই অনুগ্রহপূর্বক প্রত্যেকে গত বছরের বকেয়া গ্রাহকচাঁদা (প্রতি বছর ২৫০/- টাকা হারে) পরিশোধ করে বাধিত করবেন। পাক্ষিক আহ্‌মদী সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য পেতে যোগাযোগ করুন:
ফারুক আহমদ বুলবুল, সহকারী লাইব্রেরিয়ান, আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।

মোবাইল নং- ০১৭৩৬১২৪৭০৪, প্রয়োজনে গ্রাহকচাঁদা ০১৯১২৭২৪৭৬৯ নম্বরে বিকাশ করতে পারেন।

ওয়াসসালাম।

খাকসার
সেক্রেটারী ইশায়াত
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

পর্ব-২০

প্রাণপ্রিয় হুযূর (আই.)-এর সাথে মোলাকাতে প্রশ্নোত্তর

গত ১৪ আগস্ট ২০২১ সালে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, ডেনমার্কের সদস্যরা ভার্চুয়াল মোলাকাতে হুযূর (আই.)-এর কল্যাণময় সান্নিধ্য লাভ করেন। তারা বিভিন্ন বিষয়ে হুযূর (আই.)-কে প্রশ্ন করার সুযোগ পেয়েছিল। আমরা আজকের পর্বে এই মোলাকাতের বিশেষ বিশেষ প্রশ্নোত্তর পাঠকদের জন্য উপস্থাপন করছি।

প্রশ্ন: অধমের নাম সেলিমুদ্দিন। আমি গত ছয় বছর ধরে ডেনমার্কে বসবাস করছি। এখানকার সমাজব্যবস্থা পাকিস্তান থেকে একদমই আলাদা। হুযূর! আমরা কীভাবে আমাদের সন্তানদের ডেনিশ সমাজে একীভূত করে উত্তম তরবিয়ত দিতে পারি?

প্রিয় হুযূর (আই.): অবাক করা বিষয়! ছয় বছরে আপনি এটা বুঝতে পারেন নি? আমি গত ছয় বছরে এই বিষয়ে অনেক কথা বলেছি। সেগুলো আপনি শুনেছেন?

প্রশ্নকারী: জ্বী হুযূর, আমি শোনার চেষ্টা করেছি।

প্রিয় হুযূর (আই.): সমাজের সাথে কিভাবে একীভূত হতে হবে– সে বিষয়ে আমি অনেকবার কথা বলেছি। পিতা-মাতাদের বলেছি যে, সন্তানদের সাথে বন্ধুত্ব করুন– যাতে সে বাহিরে গিয়ে যা কিছু শিখে, সে যা কিছু আলোচনা করে, যা কিছু তাকে শিখানো হয়, এখানে স্কুলে যেভাবে একদম খোলাখুলিভাবে শিক্ষকরা শিখায়, এই সকল কথা যেন আপনার সাথে সন্তান বলে। এজন্য আপনাকে সন্তানের সাথে বন্ধুত্ব করতে হবে। যখন সে আপনার সাথে কোন কথা বলবে, তখন অবশ্যই লজ্জা না পেয়ে তাকে জবাব দিবেন। এমন কিছু প্রশ্ন থাকবে যার উত্তর দিতে পাকিস্তানের সমাজ অনুযায়ী আপনার লজ্জা লাগতে পারে। এসব বিষয়ে তাকে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে উত্তরণ দিবেন। কিছু এমন বিষয় আছে যার সম্পর্কে সন্তানদের বলতে হবে যে, তোমাদের হয়তো এই বিষয়ে স্কুলে বলা হয়েছে। কিন্তু এই কথাগুলো শোনার মত বয়স তোমাদের হয় নি। যখন তোমরা বড় হবে তখন তোমরা এই বিষয়ে জানতে পারবে। তাদের কখনও বলবেন না যে, তোমরা ভুল করেছ। তাদের বলুন, শিক্ষক তোমাদের বলছে এতে সমস্যা নেই। কিন্তু যখন তোমরা বড় হবে তখন নিজেরাই এই বিষয়ে জানতে পারবে। যখন তোমরা নির্দিষ্ট বয়সে পৌঁছাবে তখন তোমরা জবাব পেয়ে যাবে। তাই তাদের মাঝে এই অভ্যাস সৃষ্টি করুন, যেন সে সব বিষয় আপনাকে বলে। আপনাদের মাঝে বন্ধুত্বসুলভ সম্পর্ক হতে হবে।

দ্বিতীয়ত, তাদেরকে উত্তম বস্তু গ্রহণ করা শিখান। তাদের চরিত্রের ওপর বিরূপ প্রভাব রাখে এবং ধর্মীয় শিক্ষার পরিপন্থী– এমন বিষয়গুলো তাদেরকে বুঝান। তাদের হৃদয়ে প্রোথিত করুন যে, তারা আহমদী। তাদেরকে বুঝাতে হবে যে, আহমদীয়াত কী? আহমদীয়াতই প্রকৃত ইসলাম। তাদের বলুন, আমরা আহমদী; আমাদের উদ্দেশ্য এবং করণীয় সম্পর্কে তাদেরকে বলুন। তাদেরকে জাগতিক মানুষের বিষয়ে বলুন যে, তারা শুধুমাত্র জাগতিক স্বাচ্ছন্দ্য আর কামনা-বাসনার পিছনে ছুটছে। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য অনেক মহান। অতএব, তোমরা সেই উদ্দেশ্য লাভ করতে শৈশব থেকেই চেষ্টা

কর। বাকি আনুষঙ্গিক বিষয় এবং জাগতিক বিষয়ে পরবর্তীতে তোমরা নিজেরাই জেনে যাবে। এভাবে ভাবের আদানপ্রদান হলে ধীরে ধীরে বন্ধুত্ব গড়ে উঠবে যার কারণে তারাও আপনাদের সব বলবে। কিন্তু তারা যদি ভাবে যে, আমাদের বাবা-মা আমাদের কথা শুনবে না, আমাদের কোন জবাব দিবে না, তারা আমাদের প্রতি রাগ করবে, চুপ করিয়ে দিবে– তখন সমস্যা সৃষ্টি হবে।

প্রশ্ন: বৈশ্বিক সরকারব্যবস্থায় পবিত্র কুরআন পোড়ানোর মত অপরাধ দমনে সীমিত পরিসরে ব্লাসফেমী আইন কি রাখা উচিত?

প্রিয় হুযূর (আই.): এটা ব্লাসফেমী আইন রাখা বা না রাখার প্রশ্ন নয়। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর পবিত্র বস্তুর, নবীদের এবং ঐশী কিতাবের সম্মান প্রতিষ্ঠিত করেছেন আর প্রতিষ্ঠিত রাখবেন। মানবসৃষ্ট আইন এগুলো পরিবর্তন করতে পারবে না। মূল বিষয় হল, তাদের বলতে হবে যে, তোমরাই বলে থাক, অন্যের আবেগের সম্মান করা উচিত। সকল স্তরে তোমরা মানুষের আবেগের সুরক্ষার জন্য আইন পাস করেছ। আবার তোমরাই বলে থাক যে, এটি মতপ্রকাশের স্বাধীনতা। সকলের তার মত স্বাধীনভাবে প্রকাশের অধিকার রয়েছে। আর যদি এটি স্বাধীনতা হয়ে থাকে, তাহলে কারও মতামত যখন অন্যকে আঘাত করে তখন মতামত প্রকাশের সীমারেখা থাকা উচিত। স্বাধীনতার অর্থ এটি নয় যে, তোমরা মানুষের পকেট মারবে অথবা ছিনতাইকারী হয়ে যাবে। স্বাধীনতার মানে এটি নয় যে, তোমরা কারও ঘরে হামলা করে জিনিসপত্র চুরি করবে। এটি কখনও স্বাধীনতা হতে পারে না। এমন করলে আইন শাস্তি দেয় না? একইভাবে তোমরা যে শাস্তিই নির্ধারণ কর না কেন, সেটা হোক ব্লাসফেমী বা অন্যকিছু; কিন্তু শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য কমপক্ষে এই আইন পাস কর যে, একজন নাগরিককে অবশ্যই অন্যের আবেগ অনুভূতির সম্মান করতে হবে। আর যে সমাজে পারস্পরিক আবেগ অনুভূতির সম্মান করা হয়, সেখানে আপনাআপনি একটি স্থায়ী শান্তির পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হবে। আর যখন শান্তি এবং ভ্রাতৃত্বপূর্ণ পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন কেউ অন্যের আবেগ অনুভূতি নিয়ে হাসি-তামাশা করবে না। এটাই মূল বিষয় যা পৃথিবীবাসীকে বুঝাতে হবে। এছাড়া ব্লাসফেমীর জন্য আল্লাহ্ তো কোন শাস্তি নির্ধারণ করেন নি। কিন্তু আল্লাহ্ বলেছেন, তোমরা ভাই-ভাই হয়ে থাক। একটু আগেই আপনারা কুরআনের আয়াত তিলাওয়াতে শুনেছেন– 'তোমরা পারস্পরিক আবেগ-অনুভূতির সম্মান কর।' যদি এই আইন আমরা সবাই মান্য করতে পারি, তাহলে আমাদের সকল সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে। যদি সবাই এই আইন বাস্তবায়ন করতে পারে যে, শুধুমাত্র অধিকার আদায় নয় বরং অন্যদের অধিকার প্রদান করাও আমাদের কাজ। যদি এই বিষয়টি সকল নাগরিক অনুধাবন করে, তবে এটিই আমাদের ধর্ম শিক্ষা দেবে। দুই বছর আগে ২০১৯ সালের জলসায় আমি অনেক অধিকারের কথা বলেছি। এবছরও কিছু অধিকারের কথা বলেছি। যদি একজন এসকল অধিকারের প্রতি মনোযোগ দেয় তাহলে সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ নেই। তখন ব্লাসফেমী আইন প্রয়োগের প্রশ্নই ওঠে না। অন্য কোন আইন থাকারও দরকার নেই। মূল বিষয় হল, পারস্পরিক আবেগ-অনুভূতির সম্মান করা। এই বিষয়টি আমাদের অনুধাবন করা উচিত এবং বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করা এবং নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করা হলে সকল সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে এবং প্রেমপ্রীতি এবং ভ্রাতৃত্বপূর্ণ পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হবে। আর যখন এমন পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হবে তখন মানুষ একে অন্যের আবেগ নিয়ে খেলবে না, হোক সেটি ধর্মীয় অনুভূতি বা ব্যক্তিগত অনুভূতি।

প্রশ্ন: কখনও যদি এমন সময় আসে যখন দাজ্জালী শক্তি আহমদী জামা'তের সাথে যুদ্ধ করবে। আর যদি এমন হয় তাহলে আহমদীদেরও কি যুদ্ধ করতে হবে?

প্রিয় হুযূর (আই.): বিষয় হল, যখনই কোন সরকার বা জাতি ধর্মকে নির্মূল করার জন্য শক্তি প্রয়োগ করবে তখন আহমদীদের যুদ্ধ করা বা জিহাদ করার অনুমতি রয়েছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, ঈসা মসীহ্ (আ.) যুদ্ধ রহিত করবেন। ইলতিওয়া মানে হল প্রলম্বিত করা, কিছু সময়ের জন্য রহিত করা। ততক্ষণ পর্যন্ত বন্ধ রাখা যতক্ষণ পর্যন্ত সেই পরিস্থিতি সৃষ্টি না হয়। এখন ধর্মের বিনাশের জন্য অস্ত্রের ব্যবহার করার মত পরিস্থিতি নেই। যখন ধর্মের বিনাশ করার জন্য অস্ত্রের ব্যবহার হবে তখন মুসলমানদের জিহাদ করার অনুমতি রয়েছে। আর তখন আহমদীদের সবচেয়ে বেশি অগ্রগামী হতে হবে। কিন্তু এটি শুধুমাত্র ধর্মের খাতিরে। কিন্তু বর্তমানে যেসব যুদ্ধ করা হচ্ছে সেগুলো সব ভূ-রাজনৈতিক যুদ্ধ। আর তাতে স্বয়ং মুসলমানরা অন্যদের ধর্ম গ্রহণ করছে। মুসলমানরাই অমুসলিমদের থেকে অস্ত্র ক্রয় করছে। মুসলমানরাই মুসলমানদের হত্যা করছে, তা-ও অন্যদের সহায়তায়। জিহাদ কীভাবে হল? আজকের জিহাদকে কি জিহাদ বলা যায়?

অতএব, এই যুগ কলমের জিহাদের যুগ। যেভাবে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আগমনের ব্যাপারে বুখারী শরীফে লিখা আছে, ইয়াযায়ুল হারব অর্থাৎ যুদ্ধ রহিত হবে। কেননা দাজ্জালী শক্তি এবং অন্য ধর্মীয় নেতারা সাহিত্য, লেখনী এবং মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলবে। আর এর জবাবে এসব মাধ্যমই আমাদের ব্যবহার করা উচিত। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কখনও বলেন নি যে, জিহাদ একদম শেষ হয়ে যাবে। তিনি বলেছেন, যারা এই কথা শোনার পরও যুদ্ধ করবে তারা অবিশ্বাসীদের কাছে পরাজিত এবং লাঞ্ছিত হবে। যে কাফির তোমার ধর্মের বিপক্ষে যুদ্ধ না করবে, তাদের বিরুদ্ধে যদি তোমরা জাগতিক স্বার্থের জন্য যুদ্ধ কর তাহলে তোমরা অবশ্যই পরাজিত হবে। আর দেখুন, এখন ঠিকই মুসলমানরা মার খাচ্ছে। মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কথা সত্য সাব্যস্ত হয়েছে। হ্যাঁ অবশ্যই! তিনি বলেছেন, ঈসা মসীহ্ (আ.) যুদ্ধ রহিত করবেন। আর সেই

অবস্থা-পরিস্থিতি সৃষ্টির পূর্ব পর্যন্ত তিনি সত্য সত্য ধর্মযুদ্ধকে রহিত করেছেন। দোয়া করুন সেই অবস্থা যেন সৃষ্টি না হয়। আর যদি সেই অবস্থা সৃষ্টি হয় তাহলে আহমদীদের যুদ্ধ করার অনুমতি আছে। কেননা তখন শত্রুরা ধর্মকে বিনাশ করার চেষ্টা করবে। আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে যুদ্ধ করার যে অনুমতি দিয়েছেন তা প্রথমবারের মত সূরা হজ্জে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, তোমাদের যুদ্ধের অনুমতি এজন্য দেয়া হয়েছে কেননা তারা এখন সীমালঙ্ঘন করেছে, তারা ধর্ম বিনাশ করার চেষ্টা করছে। এখন যদি তাদের প্রতিহত করা না হয় তাহলে কোন সীনাগগ, চার্চ, মন্দির বা মসজিদ বাঁচবে না। পবিত্র কুরআন সকল ধর্মের উপসনালয়ের নাম বর্ণনা করেছে। এসকল উপসনালয় সুরক্ষিত থাকবে না তাই যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়েছে। অতএব, ধর্মের বিরুদ্ধে যখন কোন যুদ্ধ হবে শুধুমাত্র তখনই ইসলামে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়েছে। ইসলামে কখনও ভৌগলিক স্বার্থের জন্য যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হয় নি। আর কখনও এই উদ্দেশ্যে মুসলমানরা যুদ্ধ করে নি। নৈরাজ্য দূর করতে যুদ্ধ করা হয়েছে। কখনও জাগতিক বা ভৌগলিক স্বার্থের জন্য ইসলামে যুদ্ধ করা হয় নি। কমপক্ষে মহানবী (সা.)-এর কোন খলীফা কখনও করেন নি। পরবর্তীতে মুসলিম বাদশাহ্‌রা খলীফা উপাধি নিয়ে এমন উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করেছে। কিন্তু তখন এই ক্ষেত্রে ইসলামী শিক্ষার বাস্তবায়ন ছিল না। ইসলামী শিক্ষার অনুসরণ খোলাফায়ে রাশেদীন পর্যন্ত ছিল। ইসলামী শিক্ষার বাস্তবিক প্রয়োগ এরপর ছিল না। এরপর যুদ্ধ হতে থেকেছে, কিছু বৈধ যুদ্ধও হয়েছিল আবার কিছু অবৈধও ছিল। তাই শুধুমাত্র নৈরাজ্য দূর করতে যুদ্ধ করা বৈধ। এজন্য সূরা হুজুরাতে আল্লাহ্ বলেছেন, যদি দুটি জাতি যুদ্ধ করে, তুমি তাদের মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা কর। আর যখন যুদ্ধ শেষ হয় তখন তাদের সাথে ন্যায়বিচার কর। যদি কোন জাতি অন্য জাতির সাথে সীমালঙ্ঘন করে, তাহলে তুমি সীমালঙ্ঘনের প্রতিবাদ কর। কিন্তু যদি যুদ্ধ শেষ হয়ে যায় তখন ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য তাদের ওপর কোন ধরনের বিধিনিষেধ আরোপ কর না। যেভাবে আজকের পৃথিবীতে হচ্ছে। যুদ্ধের পরে তাদের দেশ পরিচালনায় স্বাধীনতা দেয়া উচিত। তারা নিজেদের মত দেশ পরিচালনা করুক, উন্নতি করুক। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কী হয়েছিল? দেশসমূহকে বিভক্ত করে দেয়া হয় যাতে তারা পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করে একত্র না হয়। এটি ন্যায়বিচার ছিল না। দাজ্জালী শক্তি মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোকে খণ্ডবিখণ্ড করে দিয়েছে, যাতে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে শক্তি সঞ্চয় না করতে পারে। তখন থেকেই নৈরাজ্য আর সংঘাত লেগেই আছে, যা দিন দিন বেড়ে চলছে। তারা এখন নিজেরাই দাজ্জালের সাথে মিলে আছে। যুদ্ধ কী করবে– মুসলমানরাই দাজ্জালের সাথে মিলে আছে।

প্রশ্ন: হুযূর, আপনি সাম্প্রতিক সময়ে নারীদের অধিকার নিয়ে কথা বলছেন। তারা কী কী বিষয়ে স্বামীর কাছে দাবি করতে পারে– সে বিষয়ে বলেছেন। একইভাবে স্বামী হিসেবে একজন পুরুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য কী– সেটি স্পষ্ট করেছেন। হুযূর! একজন নারীর তার স্বামীর এবং তার পরিবারের প্রতি কী দায়িত্ব রয়েছে? পুরুষের তার স্ত্রীর প্রতি কী অধিকার রয়েছে?

প্রিয় হুযূর (আই.): প্রথম বিষয় আপনি বলেছেন "আজকাল আপনি নারীদের অধিকার নিয়ে কথা বলছেন।" আজকাল আমি তো নারীদের অধিকার নিয়ে কথা বলছি না। আমি আজকাল ইসলামী ইতিহাস ও বদরী সাহাবীদের সম্পর্কে খুতবা দিচ্ছি। হ্যাঁ, আপনি বলতে পারেন, আমার সাম্প্রতিক জলসা সালানার বক্তৃতায় আমি নারীর অধিকার নিয়ে কথা বলেছি। আপনি যদি নারীদের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে নির্দেশনামূলক পূর্বের আমার কথা ছেড়ে কেবলমাত্র এই বক্তৃতার কথা ধরে বসেন, যদি আপনি এই বক্তৃতাই মনোযোগ দিয়ে শুনেন; তবে আমি অবাক হচ্ছি মানুষ হয়তো মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনে নি। আর যেহেতু কিছু বিষয় স্পষ্টভাবে তাদের পক্ষে গেছে, নারীরা তাই শুধুমাত্র সেগুলো গুরুত্ব দিয়েছে। আমি এই বক্তৃতায় নারীদের দায়িত্ব নিয়েও কথা বলেছি। আমি বিস্তারিত হাদীসের সারাংশ উপস্থাপন করেছি; যেখানে এক নারী মহানবী (সা.)-এর কাছে আসে এবং বলে পুরুষরা নামায পড়ে, আর্থিক কুরবানী করে, আয় করে, এরপর জিহাদ করে এবং হজ্জ করে। আর নারীরা এমন কাজ করতে পারে না। তাই নারীরা কীভাবে ঘরে বসে একই পুরস্কার পেতে পারে, যেভাবে পুরুষরা জিহাদে গিয়ে লাভ করে। মহানবী (সা.) বলেন, হ্যাঁ! তোমরাও একই পুরস্কার পেতে পার। এখানে এটা বলা হয় নি যে, পুরুষের কোন অধিকার নেই। এখানে বলা হয়েছে, নারীর পুরস্কার পুরুষের সমান। নারী পুরুষের সমান অধিকার এবং সমান পুরস্কার। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ অনেকবার বলেছেন, নারী ও পুরুষকে তার সৎকর্মের জন্য উত্তম প্রতিদান দেয়া হবে। নারী এবং পুরুষ সমান প্রতিদান লাভ করবে। এমনকি নারী ও পুরুষ উভয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সেই মহিলা এটাও বলেছিল যে, তারা ঘরের দেখাশুনা করে। এর মানে হল, তারা যখন ঘরের দেখাশুনা করবে তখন পুরস্কার লাভ হবে। যদি কেউ এই হাদীসে মনোযোগ দেয় তাহলে সে দেখবে যে, সেই নারী বলেছিল যে, সে ঘরের দেখাশুনা করে অর্থাৎ সে দায়িত্ব পালনকারী একজন নারী। সে সন্তানের লালনপালন করে এবং তাদের উত্তম তরবিয়ত দেয়। এক কথায় সে স্বামীর ঘরের তত্ত্বাবধায়ক। ঘরে স্বামীর সম্পদের সুরক্ষা করে। স্বামীর সম্মান ও মর্যাদার সুরক্ষা করে। অর্থাৎ সে স্বামীর বিশ্বস্ততা রক্ষা করে এবং সে স্বামীর অধিকার আদায়কারী একজন নারী। আর এ কারণেই মহানবী (সা.) বলেছেন, যদি তুমি এইসকল কাজ কর, তাহলে তোমরাও পুরুষের জিহাদ, হজ্জ এবং তাদের ইবাদতের সমান পুরস্কার লাভ করতে পারবে। এভাবে এই হাদীসে নারীদেরও উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, তোমরা এই কাজ করলে পুরস্কার লাভ

করবে। এই কথা কখন বলেছেন যে, ঘরে বসে বসেই পুরস্কার লাভ হবে? বিভিন্ন দায়িত্বের কথা বলে সেই মহিলা বলেছেন যে, তারা এসব দায়িত্ব পালন করে, এর বদলে কি তারা পুরস্কার লাভ করবে?

মহানবী (সা.) বলেছেন, অবশ্যই! তোমরা যদি এগুলো করে থাক, যদি সন্তানদের সঠিক তরবিয়ত করে থাক, স্বামীর ঘরের দেখাশুনা কর, তার অবর্তমানে যদি বিশ্বস্ততা রক্ষা কর, যদি তার সম্পদের সুরক্ষা কর এবং সকল দিক দিয়ে তার সেবা করে থাক তাহলে নিশ্চিতভাবে তোমাদের ততটাই পুরস্কার লাভ হবে যতটা পুরুষরা জিহাদ করার মাধ্যমে লাভ করবে। অতএব, এগুলো হল নারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য। আপনি কীভাবে বললেন যে, আমি শুধুমাত্র নারীর অধিকার নিয়ে কথা বলছি। এই হাদীসে একই সাথে ঘরে নারীর অনেক দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে। যদি আপনার স্ত্রী আপনার সন্তানের উত্তম তরবিয়ত নিশ্চিত করে তাহলে কি সে আপনার থেকে বিনম্র আচরণ পেতে পারে না? যদি আপনার স্ত্রী আপনার ঘরের দেখাশুনা করে তাহলে কি সে ভাল আচরণ পেতে পারে না? যদি আপনার স্ত্রী তার সম্মান ও মর্যাদা সমুন্নত রাখে এবং আপনার প্রতি আন্তরিক হয় এবং বিশ্বস্ততা রক্ষা করে এবং সে যদি আপনার ভালবাসার অধিকার আদায় করে তাহলে কি সে উত্তম আচরণ পেতে পারে না? পেতে পারে কি না? তাহলে কীভাবে শুধুমাত্র নারীর অধিকার নিয়ে কথা বললাম? বরং নারী ও পুরুষ উভয়ের অধিকারের কথা বলা হয়েছে। যদি কেউ এই হাদীসে মনোযোগ দেয় তাহলে সে নারী ও পুরুষ উভয়ের অধিকার দেখতে পাবে। অতএব, উভয়ের এই অধিকার রয়েছে। পুরুষকে অমুক কাজের জন্য পুরস্কার দেয়া হবে। আর নারীদের অমুক অমুক কাজের প্রতিদান দেয়া হবে। হ্যাঁ পুরুষকে বলা হয়েছে তোমরা নারীর সাথে উত্তম আচরণ কর। একারণে নারীর সাথে উত্তম আচরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যদি নারী তোমার অধিকার আদায় করে তাহলে তাদের সাথে উত্তম আচরণ করা আবশ্যক।

প্রশ্ন: আমার প্রশ্ন হল, আমরা সাধারণত দেখে থাকি মিডিয়ায় আমাদের মুসলিমদেরকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে টার্গেট করা হয়। আমার প্রশ্ন হল, তারা কেন মুসলমানদের টার্গেট করে?

প্রিয় হুযূর (আই.): তারা কেন করে থাকে, এটা শুধুমাত্র তারাই বলতে পারবে। একজন ব্যক্তি যদি বোকার মত আচরণ করে এবং অন্যায় আচরণ করে তাহলে তাকেই জিজ্ঞেস করতে হবে যে, কেন করে? আমি তোমাকে কীভাবে বলব? হ্যাঁ! প্রকৃত বিষয় হল, পৃথিবীবাসী ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা জানে না। পৃথিবীবাসী দেখছে যে, সিরিয়ায় মুসলিমরা একে অপরকে হত্যা করছে। পৃথিবীবাসী দেখছে, ইয়েমেনে অন্যায় হচ্ছে। পৃথিবীবাসী দেখছে, তালেবান অন্যায় অবিচার করছে। পৃথিবীবাসী দেখছে, আল-কায়দা অযথা অন্যায় করছে। পৃথিবীবাসী দেখছে, মুসলমানরা কিছু বিষয়ে ইউরোপের বিরুদ্ধে বলছে। যদিও কিছু বিষয় আসলেই ঠিক না। এছাড়া বোকো হারাম, আল শাবাবসহ এরকম অন্যান্য সংগঠন, যারা মুসলমান হওয়ার দাবি করে আবার অন্যায় আচরণ করে। এই কারণে পৃথিবীবাসী ইসলামকে টার্গেট করছে। যদি আমরা তাদের প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা বলি, যেভাবে আমরা আমাদের শান্তি সম্মেলনে করে থাকি অথবা আমি যেখানেই যাই সেখানেই শান্তি সম্মেলনের মাধ্যমে বলে থাকি। আমি বেশ কয়েকবারই বলেছি। যেমন গতকাল খুতবায় আমি ঘটনা শুনিয়েছি আর সবসময় শুনিয়ে থাকি। এই ইসলামকে সমর্থন করতে এবং এর সপক্ষে কথা বলতে সবাই প্রস্তুত। তাই দুর্বলতা আমাদের, কেননা আমরা পৃথিবীবাসীকে ইসলামের শিক্ষা জানাচ্ছি না। এই যুগে পৃথিবীবাসীকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা জানানো হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জামাতের কাজ। অতএব, এটি আপনাদের দায়িত্ব; যখনই কোন ঘটনা ঘটে তখন ইসলামের শিক্ষা স্পষ্ট করে বর্ণনা করুন যে, এটা হল ইসলামের শিক্ষা, এটা সঠিক আর এটা ভুল। ইসলাম সম্পর্কে ছোট ছোট প্রবন্ধ লিখতে থাকুন। কোন সুযোগ হাত ফসকে যেতে দিবেন না। অতএব, যখন পৃথিবীবাসী সত্য অনুধাবন করবে এবং প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা অনুধাবন করবে, তখন তারা ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলবে না। অতএব, এই যুগে পৃথিবীবাসীকে জানানো আমাদের দায়িত্ব। আর যতদূর সম্ভব আমরা জানাই। আপনারাও আপনাদের দেশে প্রচার করুন। শান্তির বিষয়ে বিজ্ঞাপন, লিফলেট বিতরণ করুন। ডেনমার্ক অনেক ছোট দেশ। আপনাদের দেশের প্রত্যেক নাগরিকের কাছে ইসলামের শান্তির শিক্ষা পৌঁছানো উচিত ছিল। আপনারা লিফলেট বিতরণ করুন। আপনাদের মোট জনসংখ্যা কত?

প্রশ্নকারী: ৫০ লক্ষ।

প্রিয় হুযূর (আই.): ৫০ লক্ষ তো কোন বড় সংখ্যা নয়। ৫০ লক্ষ মানুষের কাছে সহজেই লিফলেট পৌঁছানো সম্ভব। তাদের সামনে ইসলামের সুন্দর শিক্ষা তুলে ধরুন। প্রথমত এটি প্রচার করুন। এরপর বলুন, ইসলামের এই সুন্দর শিক্ষা প্রচারের জন্য আল্লাহ্ তা'লা মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে প্রেরণ করেছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে বাণী না পৌঁছায় ততক্ষণ এই সবকিছুই আমাদের দায়িত্ব। সবার কাছে ইসলামের শিক্ষা পৌঁছানো এবং মিডিয়ার কাছে পৌঁছানো আপনাদের দায়িত্ব। মিডিয়ার সাথে বন্ধুত্ব করুন এবং তাদেরকে অবহিত করুন। তাদেরকে আপনাদের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানান এবং সম্পৃক্ত করুন। তাদের সাথে একটি বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরি করুন, যাতে তারা আপনার প্রবন্ধ প্রকাশ করে। তখন তারা সত্য অনুধাবন করতে পারবে। অন্যথায় যদি মিডিয়া শুধুমাত্র নামেমাত্র মুসলমানের অন্যায় কাজ দেখে তাহলে মিডিয়া যা দেখছে তাই বলবে। যখন আমরা তাদেরকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা জানাই তখন তারা লজ্জিত হয়ে বলে; ভুলবশত আগের রিপোর্ট করা হয়েছে। আমার সামনে অনেকেই এমন বলেছে এবং তারা এরপর থেকে ইসলামের সপক্ষে লিখেছে। *... (চলবে)*

ভাষান্তর: মাওলানা মসীহ্ উর রহমান

আমার শ্বশুর মরহুম শাহাবুদ্দিন সাহেব স্মরণে

খোরশেদ জাহান

আমার শ্বশুর মরহুম শাহাবুদ্দিন সাহেব স্মরণে ব্যক্তিগত কিছু কথা সবার উদ্দেশ্যে উল্লেখ করছি।

এক. আব্বা বাসায় কখনও কুকুর বিড়াল পালতেন না। কিন্তু আমাদের গলির কুকুরগুলোর জন্য ছিল তাঁর অসীম মায়া। তিনি বলতেন, আমাদের যে রিযিক আল্লাহ্ দিচ্ছেন তাতে এদেরও অধিকার আছে। রমযান মাসে প্রতিদিন সেহরির পর নিজ হাতে ভাত মেখে রাস্তার কুকুরগুলোকে দিয়ে আসতেন আর বলতেন, সারারাত ধরে এরা আমাদের পাহারা দিয়ে দিয়ে ক্ষুধার্ত। দিনের বেলা আব্বা রাস্তায় বের হলেই একটা কুকুর আব্বার পেছনে পেছনে দোকান পর্যন্ত যেত। দোকানে পৌঁছে আব্বা একটা কেক কিনে প্যাকেট খুলে ওকে দিতেন আর হাসতে হাসতে বলতেন- এর কেক খুব পছন্দ। হয়তো এটা উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনাই না, কিন্তু কত ছোট ছোট বিষয়ে আব্বার কি গভীর মনোযোগ ছিল ভেবে অবাক হই। সারা বছর তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে এই রাস্তায় পড়ে থাকা কুকুরগুলোর যত্ন নিয়ে যাচ্ছেন- কী অদ্ভুত বিষয়!

দুই. একদিন ব্যাংকে কিছু টাকা জমা দিতে বের হলেন। দুপুরে বাসায় এসে খেতে বসে সেদিনের ঘটনা শুনালেন যার সারাংশ অনেকটা এমন: হাসপাতালে একজন আহমদী রোগী ভর্তি শুনে আব্বা দেখতে গিয়েছিলেন। গিয়ে দেখেন সেই রোগীর চিকিৎসার জন্য কিছু টাকার প্রয়োজন যার সামর্থ্য তার নেই। আব্বার হাতে ব্যাংকে জমা দেয়ার যে টাকাটা ছিল সবটাই রোগীর হাতে দিয়ে খুশিমনে বাসায় চলে এলেন।

তিন. নিজের জন্য তিনি ছিলেন ভীষণ মিতব্যয়ী। একই কাপড় দিনের পর দিন ধুয়ে, মাড় দিয়ে, ইস্ত্রি করে পরতেন। জুতা ছিঁড়ে গেলে বারবার সেলাই করাতেন। কিন্তু দরিদ্র কারও চিকিৎসা, শিক্ষা বা বিয়ের জন্য যেকোনো খরচে তিনি একবিন্দু দেরি করতেন না। হাসপাতালে ভর্তি রোগীর জন্য খাবার পাঠাচ্ছি শুনলে তিনি ভীষণ খুশি হতেন। কেউ মারা গেলে সেই বাড়িতে খাবার পাঠাতেও খুব পছন্দ করতেন।

চার. আমাদের বাসার খাবার সবসময়ই খুব সাধারণ মানের হয়ে থাকে, কারণ আব্বা অধিক রান্না বা খাবার নিয়ে মহিলাদের সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকা পছন্দ করতেন না বরং তিনি বলতেন, সেই সময়টা বাঁচিয়ে তোমার বাচ্চাদের জন্য ব্যয় কর, বেশি ঝামেলার দরকার নেই। বেঁচে থাকার জন্য যতটুকু না করলেই নয় ততটুকুই কর। অথচ এই মানুষই বাসায় কোন মেহমান এলে তাকে খুশি করার সর্বাত্মক চেষ্টা করতেন। বাসায় অতিথি এলে বাজার থেকে বড় মাছ, ভাল মাংস খুব আনন্দের সাথে কিনে আনতেন আর বলতেন- যত্ন করে রান্না কর। বাসার

সবচেয়ে ভাল এবং সুবিধাজনক রুমটা তিনি অতিথির জন্য ছেড়ে দিতেন। অতিথির জন্য কি রান্না হচ্ছে- সে বিষয়ে বারবার খোঁজ নিতেন।

পাঁচ. আমার আব্বা বিয়ের সময় আমার শ্বশুরের হাতে আমাকে সঁপে দিয়েছিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি আমার বাবার সঁপে দেয়া সেই আমানতের পরিপূর্ণ যত্ন নিয়েছেন। আমার কোন অসুবিধা তাঁর দৃষ্টিগোচর হলে সাথে সাথে তা সমাধানের সর্বাত্মক চেষ্টা করতেন। আমি যতবার অসুস্থ হয়েছি ততবারই তিনি আমার এত শুশ্রুষা করেছেন যা দেখে আমি লজ্জিত হতাম। আমি কেন তাকে আব্বা বলে ডাকি- আমার ছোট মেয়ের এমন প্রশ্নের উত্তরে

তিনি বলেন, তোমার মা-ও আমার একটা মেয়ে। আমি ওকে তোমার নানার কাছ থেকে চেয়ে এনেছি। তাই সে আমার মেয়ে আর আমি তার বাবা।

ছয়. বাসার সব কাজে তিনি আমাকে প্রায়শ সাহায্য করতেন। নিজের কাপড় তিনি হাসপাতালে যাওয়ার আগের দিন পর্যন্ত নিজে ধুয়েছেন। নিষেধ করলে বলতেন, কাপড় ধুলে হাতের তালুর নার্ভগুলোতে প্রেশার পড়ে যা শরীরের জন্য ভাল। নোংরা বা ময়লা পোশাক পরা তিনি অপছন্দ করতেন। প্রায়ই বলতেন, চাকুরী জীবনের শুরুতে তাঁর একটাই পাঞ্জাবী ছিল। প্রতিদিন অফিসের পর বাসায় এসে সেটা ধুয়ে দিতেন। শুকালে গরম পানির ডেকচি দিয়ে সেটা ইস্ত্রি করে পরেই তবে অফিসে যেতেন। মানুষকে নিজের দারিদ্র্য প্রদর্শন করা তাঁর কাছে অপছন্দনীয় ছিল। নিজের যা ছিল, যতটুকু ছিল- তা নিয়ে তিনি আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন এবং সদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি থাকতে পছন্দ করতেন।

সাত. তিনি অনেক বেশি উপদেশ দিতেন না। তাঁর প্রাত্যহিক জীবনের প্রত্যেকটা আচরণই ছিল আমাদের জন্য উপমাবিশেষ। হুযূর (আই.) খুতবায় হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর সাহাবীদের জীবনচরিত নিয়ে আলোচনা করলে তিনি সেগুলো নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করার সর্বাত্মক চেষ্টা করতেন। যারা বলে- এই যুগে সাহাবীদের মত জীবনযাপন করা সম্ভব না, তাদেরকে আমি হলফ করে বলতে পারি- আব্বা শাহাবুদ্দিন সাহেব যেন সাহাবীদের প্রতিচ্ছবি। আমার দেখামতে তাঁর মাঝে জাগতিক কোন লোভ-লালসার ছিটেফোঁটাও ছিল না।

আট. জামাতের প্রতি তাঁর যে অপরিসীম ভালবাসা ছিল তা ভাষায় ব্যক্ত করা দুরূহ। আমার তিন বাচ্চা নিয়ে সংসারের শত ঝামেলা জেনেও যদি শুনতেন জামা'তের প্রয়োজনে আমাকে কোথাও যেতে হবে তাহলে বারণ করা তো দূরের কথা- খুব খুশি হতেন। বারবার জামা'তের কর্মকর্তাদের এতায়াতের বিষয়ে সাবধান করতেন। জামা'তের কাজে তাঁর অভিজ্ঞতার বিষয়গুলো গল্প আকারে আমাদেরকে বলতেন। গত বছর কোভিডের ভয়াবহতা শুরু হলে আমার স্কুল বন্ধ হয়ে যায় এবং মাসিক বেতনও বেশ কিছুটা কমিয়ে দেয়া হয়। জুলাই মাসে নতুন বছরের বাজেট লেখানোর সময় আমাকে বললেন, তুমি চাঁদা আমের বাজেট কমাবে না বরং আগেরটাই রাখ, আল্লাহ্‌ বরকত দিবেন। অতএব আমি বাজেট কমালাম না। আল্লাহ্‌ তা'লার অশেষ কৃপায় কিছুদিনের মধ্যেই আমার বেতন বেড়ে আবার আগের সমান হয়ে গেল। আব্বাকে যখন জানালাম তখন তিনি উচ্ছ্বসিত হলেন।

নয়. অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে থাকা তাঁর জন্য কষ্টকর ছিল। তাই যেকোনো অসুখে দ্রুত সুস্থ হওয়ার খুব চেষ্টা করতেন। অনেক বছর ধরে তিনি ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ছিলেন। কিন্তু সবসময়ই নিজের শরীরের খুব যত্ন নিতেন। নিজেই হারবাল চিকিৎসার সহায়তা নিতেন। ছোটখাটো অসুবিধায় ডাক্তারের কাছে না গিয়ে নিজেই হোমিওপ্যাথ ও হারবাল চিকিৎসা করতেন। আমাদের বলতেন, অকারণে ডাক্তারের পেছনে টাকা ব্যয় না করে স্বাস্থ্যকর খাওয়াদাওয়া ও শারীরিক পরিশ্রম করা উচিত। বাচ্চারা আসরের পর বিছানায় শুয়ে থাকলে তাদের উঠিয়ে বাইরে খেলাধুলা করতে পাঠাতেন। যখনই সংসারের কোনো কাজ করতেন তখন বাচ্চাদেরও ডাকতেন এবং তাদেরকেও কাজ শেখাতেন। বাচ্চাদের সবসময় মা-কে সাহায্য করার বিষয়ে জোর তাগিদ দিতেন। কখনও আমি অসুস্থ হলে আমার বাচ্চাদের দিয়ে বারবার আমাকে জিজ্ঞেস করতেন যে, কোন কিছু লাগবে কিনা, ওষুধ খাওয়া হয়েছে কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমার শ্বশুর আমার দেখা সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ যিনি একাধারে সহজ-সরল, বিনয়ী এবং সততার বাস্তবমূর্তি ছিলেন। তাঁর জীবন থেকে শেখার মত অগণিত বিষয় তিনি আমাদের জন্য রেখে গিয়েছেন। তিনি ছিলেন আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এক বিশেষ নেয়ামত। আমার যেকোনো অসুবিধায় তাঁর একটা কথা আমাকে প্রশান্তি দিত- তুমি চিন্তা কর না, আমি নামায পড়ে তোমার জন্য দোয়া করছি। আমি আশা রাখি, আল্লাহ্‌ তা'লা নিশ্চয়ই নিজ সন্নিধানে আমার আব্বাকে অনেক ভাল রেখেছেন।

"আহ্‌মদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের একমাত্র মুখপত্র "আহ্‌মদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে এ দিকনির্দেশনা দেয়া যাচ্ছে যে, এখন থেকে যারাই এতে লেখা ও সংবাদ পাঠাতে ইচ্ছুক, তারা এ পত্রিকার সম্পাদক বরাবর নিম্ন ঠিকানায় পাঠাবেন।

বরাবর– **সম্পাদক, পাক্ষিক আহ্‌মদী,**
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪নং বকশিবাজার রোড, ঢাকা-১২১১
E-mail: pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com

গায়ের আহমদী বিবাহের ক্ষেত্রে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাবধান বাণী

যেহেতু খোদা তা'লার বিশেষ অনুগ্রহে আমাদের জামা'তের সদস্য সংখ্যা অতি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে আর বর্তমানে তা হাজার হাজারে গিয়ে উপনীত হয়েছে এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তা অচীরেই লক্ষ-তে পৌছে যাবে। (এখন আল্লাহ্‌র কৃপায় তা কোটিতে উপনীত হয়েছে) তাই হিকমত ও প্রজ্ঞার দাবি হল, এদের পারস্পরিক ঐক্য বৃদ্ধি করার জন্য, এবং এদের পরিবার পরিজন আর আত্মীয় স্বজনের মন্দ বা কুপ্রভাব থেকে আর মন্দ পরিণাম থেকে রক্ষা করার জন্য ছেলে-মেয়েদের বিবাহের বিষয়ে কোন উত্তম ব্যবস্থাপনা থাকা প্রয়োজন।

এ কথা স্পষ্ট, যারা বিরোধী মৌলবীদের প্রভাবে বা ছত্রছায়ায় বিদ্বেষ, হিংসা আর কার্পণ্য এবং শত্রুতার চরম সীমায় উপনীত, যতদিন তারা তওবা করে এই জামা'তে অন্তর্ভূক্ত না হয়, ততদিন তাদের সাথে আমাদের জামা'তের সদস্যদের নতুন বৈবাহিক সম্বন্ধ করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। আর এ জামা'ত সম্পদে, জ্ঞানে, কল্যাণে, বংশ মর্যাদার দিক দিয়ে, পুণ্যের দিক দিয়ে কোন ক্ষেত্রেই এখন তাদের মুখাপেক্ষী নয়, এমনকি তাকওয়া পরায়ণ অসংখ্য লোক এ জামা'তে বিদ্যমান। আর প্রত্যেক ইসলামী গোষ্ঠীর লোক এ জামা'তে অন্তর্ভুক্ত আছে। এ ক্ষেত্রে কোন অবস্থাতেই আমাদের জামা'তের সদস্যদের এমন কারও সাথে বৈবাহিক সম্পর্কে জড়ানো সমীচীন হবে না– যারা আমাদেরকে কাফের বলে, আমাদেরকে দাজ্জাল বলে আখ্যা দেয় অথবা নিজেরা না বললেও এমন বক্তব্য প্রদানকারীদের গুণগান করে এবং তাদের অনুগামী।

স্মরণ রাখবেন! যারা এমন লোকদের পরিত্যাগ করতে না পারে, তারা আমাদের জামা'তে অন্তর্ভুক্তির যোগ্য নয়। যতদিন পর্যন্ত পবিত্রতা ও সত্যের জন্য এক ভাই নিজ ভাইকে পরিত্যাগ করতে না পারে, পিতা নিজ পুত্র থেকে পৃথক হতে না পারে, ততদিন পর্যন্ত তারা আমাদের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে না। অতএব সমস্ত জামা'ত মন দিয়ে শুনুন! সত্যনিষ্ঠ হবার জন্য এ শর্ত মানা আবশ্যক।

(মজমুআয়ে ইশতেহারাত, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৫০-৫১)

সংবাদ

নবম স্থানীয় বার্ষিক ইজতেমা-২০২১ নূরনগর লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত

গত ৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ লাজনা ইমাইল্লাহ্, নূরনগরের নবম স্থানীয় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোহতরম রওশন আরা, প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্, নূরনগর। কুরআন পাঠ, আহাদ পাঠ এবং সভাপতি সাহেবের বক্তব্য ও স্থানীয় মুরব্বী সাহেবের মাধ্যমে দোয়া পরিচালনা এবং স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট সাহেব অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা হয়। কুরআন তিলাওয়াত, নযম, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, সভাপতি সাহেবের বক্তব্য, পুরস্কার বিতরণ এবং দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে লাজনা সদস্য সংখ্যা ১৫ জন, নাসেরাত সংখ্যা ১ জন, শিশু ৪ জন ও মেহমান ১ জনসহ মোট ২১ জন উপস্থিত ছিলেন।

রওশন আরা, প্রেসিডেন্ট
লাজনা ইমাইল্লাহ্, নূরনগর

একটি শোক সংবাদ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, তাহেরাবাদের একজন প্রবীণ সদস্যা মোহতরমা আছিয়া বেওয়া (প্রেসিডেন্ট সাহেবের আম্মা) করোনায় আক্রান্ত হয়ে গত ১২ আগষ্ট রোজ বৃহস্পতিবার বিকাল ৪.৩০ মিনিটে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল আনুমানিক ৯৫ বছর। তিনি ২০১৪ইং সালে বয়আত করে আহমদীয়া জামা'তভুক্ত হন এবং আমৃত্যু খেলাফতের সাথে বিশ্বস্ত সম্পর্ক রেখেছিলেন। মরহুমা নিয়মিত ৫ ওয়াক্ত নামায আদায় ও নিয়মিত চাঁদা আদায় করতেন। তিনি মিষ্টভাষী, বিনয়ী, সরলমনা মানুষ ছিলেন। প্রতিবেশীরা অর্থাৎ আহমদী ও গায়ের আহমদী সবাই মরহুমাকে ভাল মানুষ রূপেই জানত। মৃত্যুকালে তিনি তিনপুত্র, তিনকন্যা এবং অনেক নাতি-নাতনীসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। মরহুমার জানাযা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। বাংলাদেশের সকল আহমদী ভাই- বোনদের নিকট মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত লাভের জন্য খাসভাবে দোয়ার আবেদন করছি।

মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান, জেনারেল সেক্রেটারী
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, তাহেরাবাদ
খাঁয়ের হাট, বাঘা রাজশাহী

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর হাতে

বয়আত গ্রহণের দশটি শর্ত

১

বয়আতকারী সর্বান্তঃকরণে এ কথার অঙ্গীকার করবে, এখন থেকে ভবিষ্যতে কবরে না যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক থেকে সে বিরত থাকবে।

২

মিথ্যা, ব্যভিচার, কামলোলুপদৃষ্টি, সকল প্রকার অবাধ্যতা ও পাপাচার, অন্যায়, খিয়ানত এবং নৈরাজ্য ও বিদ্রোহের সকল পথ পরিহার করে চলবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যতই প্রবল হোক না কেন, এর কাছে পরাভূত হবে না।

৩

খোদা ও রসূল (সা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী বিনা ব্যতিক্রমে নিয়মিত পাঁচ বেলার নামায পড়বে। আর যথাসাধ্য তাহাজ্জুদ নামায পড়ার ও প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি দরূদ প্রেরণের এবং নিজ পাপসমূহের জন্য প্রত্যহ ক্ষমাপ্রার্থনা ও ইস্তেগফার করার স্থায়ী অভ্যাস করবে। আন্তরিক ভালবাসার সাথে খোদা তা'লার অনুগ্রহরাজি স্মরণ রেখে তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করাকে দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিণত করবে।

৪

প্রবৃত্তির উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে সামগ্রিকভাবে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে আর বিশেষকরে মুসলমানদেরকে কথায়, কাজে অথবা অন্য কোনভাবে অন্যায় কষ্ট দিবে না।

৫

সুখে-দুঃখে, স্বাচ্ছন্দ্যে-কাঠিন্যে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদা তা'লার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। সকল অবস্থা ও পরিস্থিতিতে ঐশী সিদ্ধান্ত সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিবে। তাঁর পথে সকল প্রকার লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকবে। কোন বিপদ এসে উপস্থিত হলে তাঁর প্রতি বিমুখ হবে না বরং সম্মুখপানে এগিয়ে যাবে।

৬

সামাজিক কদাচার ও কুপ্রবৃত্তির দাসত্ব পরিহার করবে। কুরআনের অনুশাসন শতভাগ শিরধার্য করবে এবং আল্লাহ্ ও রসূল (সা.)-এর নির্দেশনাবলীকে নিজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কার্যবিধি হিসেবে অবলম্বন করবে।

৭

অহংকার ও দম্ভ সর্বতোভাবে পরিহার করবে। নম্রতা, বিনয়, সদাচরণ, সহনশীলতা ও দীনতার সাথে জীবনযাপন করবে।

৮

ধর্ম ও ধর্মের সম্মান এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধনপ্রাণ, মানসম্ভ্রম, সন্তানসন্ততি ও সকল প্রিয়জন হতে প্রিয়তর জ্ঞান করবে।

৯

কেবল আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে তাঁর সৃষ্ট সকল জীবের সেবায় রত থাকবে এবং খোদাপ্রদত্ত নিজ শক্তি ও সম্পদ ব্যয়ে মানবজাতির যথাসাধ্য হিতসাধন করবে।

১০

শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মা'রুফ তথা ধর্মানুমোদিত সকল আজ্ঞা পালন করার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের সাথে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আমৃত্যু এতে অটল থাকবে। আর এই ভ্রাতৃত্ববন্ধনে এমন মহান পর্যায়ে উপনীত থাকবে যার দৃষ্টান্ত জাগতিক কোন সম্পর্ক ও বন্ধনে অথবা তাবৎ সেবকসুলভ অবস্থার মাঝে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

(ইশ্‌তেহার তকমীলে তবলীগ: ১২ জানুয়ারি, ১৮৮৯ইং)

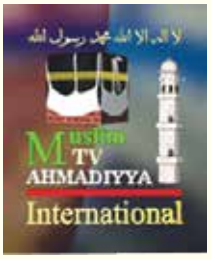

এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময়সূচি

(১) শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং ভোর-রাত ৪.০০।

(২) শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

(৩) রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

(৪) বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

Muslim TV AHMADIYYA International

mta INTERNATIONAL

এমটিএ দেখুন অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

50% OF SMALL BUSINESSES AREN'T USING SOCIAL MEDIA PROPERLY TO PROMOTE THEIR BUSINESS.

TO KEEP AHEAD OF THE CURVE, YOU NEED -

* DIGITAL MARKETING STRATEGY
* PROMOTIONAL VIDEO
* FACEBOOK PROMOTION
* PRODUCT PHOTOGRAPHY
* PRODUCT VIDEOGRAPHY

STUDIO JUNCTION ENTERTAINMENT REIMAGINED

Find us on STUDIOJUNCTIONBD

Dental Care

ডাঃ মোঃ সাদিউল রাফি
বি. ডি. এস (ঢাকা), পিজিটি (ওরাল এন্ড ম্যাক্সিলোফেসিয়াল সার্জারী)
শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
বিএমডিসি রেজিঃ নং-৪৬৩৩, **মোবাঃ ০১৯২০-১৫৯১৯৭**

ওরাল এন্ড ডেন্টাল সার্জন

চেম্বার ঃ
ডাঃ রাফি ওরো-ডেন্টাল সার্জারী
১২৫৭, বাগানবাড়ী মোড় (পানির পাম্প সংলগ্ন), পূর্ব জুরাইন, ঢাকা-১২০৪

সাক্ষাতের সময় ঃ
বিকাল ৫টা - রাত ৯টা
(মঙ্গল - শুক্রবার)

সিরিয়ালের জন্য ঃ ০১৭১০-৭৭৬৮৬৫

New Vol. No. 84 | 5th Issue

The Ahmadi Fortnightly Since 1922

15th September, 2021 Tk. 20.00

Regd. No. D. A.-12

বিশ্বজনীন মহামারী করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় করণীয়

হুওয়াশ্ শাফী

করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের লক্ষণাদি পর্যবেক্ষণ করে নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান খলীফা নিম্নলিখিত হোমিও ঔষধ প্রতিষেধকরূপে (কমপক্ষে তিন সপ্তাহ সেব্য) প্রস্তাব করেছেন। এগুলো বাজার থেকেও কিনে নিতে পারেন আবার চাইলে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের জাতীয় কেন্দ্রের হোমিও ডিস্পেন্সারী থেকেও সংগ্রহ করতে পারেন। ঔষধগুলো নিম্নরূপ:

১. **(Aconite + Arsenic + Gelsimium)- 200**

২. **Chelidonium Q (Mother tincture)**

বড়দের জন্য

১। ৫টা করে বড়ি সপ্তাহে ২বার করে সেব্য।

২। ৪ চামচ পানিতে ১০ ফোটা ঔষধ মিশিয়ে সপ্তাহে ৩দিন অর্থাৎ ২দিন পর পর ১বার সেব্য।

৫-১৫ বছরের শিশু ও গর্ভবতী মহিলাদের জন্য

১। প্রতি সোমবার ৫টি করে বড়ি সেব্য।

২। প্রতি বৃহস্পতিবার ৪ চামচ পানিতে ১০ ফোটা ঔষধ মিশিয়ে সেব্য।

৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য

১। ৪টা করে বড়ি প্রতি সোমবার সেব্য।

উল্লেখ্য, প্রকাশিত লক্ষণাদি দেখে এসব ঔষধ প্রস্তাব করা হয়েছে। দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা যেন এগুলোতে কার্যকারিতা দান করেন, আমীন। মহান আল্লাহ্ই একমাত্র আরোগ্যদাতা।

প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন:

ডা. রবিউল হক, ০১৭৩৫-১৫০৮১৫

মহামারী থেকে নিরাপদ থাকার দোয়া

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ، وَالْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَمِنْ سَيِّئِ الأَسْقَامِ

অর্থ: হে আমার আল্লাহ! আমি তোমার কাছে কুষ্ঠরোগ, উন্মাদনা, শ্বেত রোগ এবং সকল মন্দ রোগব্যাধি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

بِسْمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

অর্থ: সেই আল্লাহ্‌র নামে যাঁর নামের দোহাই দিলে আকাশ ও পৃথিবীর কোন জিনিষই অনিষ্ট সাধন করতে পারে না এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

অর্থ: আমি আল্লাহ্‌র পূর্ণাঙ্গিন গুণবাচক নামের দোহাই দিয়ে তাঁর সৃষ্টির সকল অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

الْحَمْدُ لله الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلاَكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً

অর্থ: সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে সেই আপদ থেকে রক্ষা করেছেন যাতে তুমি (হে অসুস্থ ব্যক্তি) জর্জরিত আর তিনি আমাকে তাঁর সৃষ্টির অনেকের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।

رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُكَ رَبِّ فَاحْفَظْنِيْ وَانْصُرْنِيْ وَارْحَمْنِيْ

অর্থ: হে আমার প্রভু! সবকিছুই তোমার সেবক মাত্র অতএব হে প্রভু! তুমি আমাকে রক্ষা কর, আমাকে সাহায্য কর এবং আমার প্রতি তুমি কৃপা কর।

এছাড়া সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক্ব, সূরা নাস প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যা তিনবার।

Printed and Published by **Ahmadiyya Art Press,** 4 Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211
on be half of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Sheikh Mostafizur Rahman**
Phone: +880-2-57300808, 57300849, Fax: +880-2-57300880, E-mail: pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
www.theahmadi.org (Pakkhik Ahmadi web site live now)